আসমান-জমিন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

দাম দুই টাকা চারি আনা

প্রকাশক :
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রিট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রংমশাল প্রেস লিমিটেড
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট,
কলিকাতা

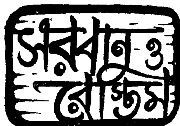
সূচীপত্র

এই গল্পগুলির রচনাকাল ১৩৫১-৫২

গ্রন্থকারের অন্যান্য সাম্প্রতিক গল্পের বই

কাঠ-খড়-কেরাসিন

কালো রক্ত



খোকা মারা গেল। পাশেই ঝুরুলি গ্রাম। সেখানে লোক গিয়েছিল রোস্তমকে ডেকে আনতে। যদি অন্তত এ সময়েও সে আসে। কিন্তু সে এল না। বরং বলে পাঠাল, কার না কার ছেলে—তার ঠিক নেই।

কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সরবানু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল।

পাড়ার মুরুব্বি এসে বললে, এবার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হক। কারী এল। বাজার থেকে এল নতুন কাপড়, গোলাপজল, আতর-কর্পূর। এল খাটিয়া। খোকাকে একটা তক্তার উপরে শুইয়ে সরবানুর নানী গরম জলে তার গা ধুইয়ে দিল। খাটিয়ার উপর পাতলা কাপড়—দুটো চাদর, একটা খেলকা। ছিটিয়ে দিল আতর-কর্পূর, গোলাপজল। খোকাকে এনে তার উপর শুইয়ে খেলকা আর চাদর মুড়ি দিয়ে মাথার উপর, পায়ের তলায় আর মাজায় তিন বাঁধন দেওয়া হল।

নতুন কাপড়ের সুতোর বাঁধন। তারপর কারী জানাজা নামাজ পড়লে। তারপর—তারপর খোকাকে নিয়ে গেল কবরখোলায়। জন্মের মত চোখের আড়াল হয়ে গেল সরবানুর।

শুনেছে বাড়ির পাশেই, বাগানে, খোকাকে গোর দেওয়া হয়েছে। কবরের উপর বাঁশ দিয়ে তার উপর মাদুর দিয়ে তার উপর মাটি দিয়েছে। জাফরির বেড়া দিয়েছে চার ধারে যাতে শেয়াল এসে না খোঁড়ে। এত কাছে, তবু যেন কোথায়!

ছেলে সবে তিন মাস পেটে এসেছে, সরবানু চলে আসে তার বাপের বাড়ি। তারপর এই কেটে গেল তিন বছর। একটানা।

সে কি অমনি এসেছে? অমনি কি কেউ আসে? এলেও বাপের বাড়িতে বসে অশান্তির ভাত খায়?

তাকে তার স্বামী আর শাশুড়ি তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, মারধোর করত, মুখে কাপড় পুরে ঝাঁটা দিয়ে ঠেসে রাখত। মার সহ্য করা যায়, কিন্তু খিদে বোধ হয় সহ্য করা যায় না। ওকে দিত এই খাওয়ার কষ্ট। কুকুর-বাঁধা লোহার শিকল দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখত ওকে, কিছু এসে যেত না, যদি খেতে দিত পেট ভরে, একটু বা আদর-ভক্তি করে। থালা-বাসনে না দিয়ে মালসায় করে ভাত দিত, যে-মালসায় কুকুরে খায়। তাও নুন জল ভাত সব একত্র করে। নুন-জলের বেশি আর কিছু মিলত না ডাল-তরকারি।

অপরাধ কি সরবান্নুর? সরবান্নু খুবসুরৎ নয়। সে বে-পছন্দের মেয়ে।

ধারধোর করে বাপ বিয়ে দিয়েছিল তার। দিয়েছিল সোনার পার্শি-মাকড়ি, নোলক আর সিতাপাটি। রুপোর চুড়ি ছয় গাছা, তাবিজ দুই পাটি, মল এক জোড়া। সব কেড়ে নিয়ে গেছে ওরা। ওরা যা দিয়েছে তা তো কোনো দিন গায়েই ওঠেনি। মুখ-দেখানি দিয়ে গিয়েছিল পাঁচটি টাকা, তাও আঁচলের খুঁট থেকে কবে খুলে নিয়েছে।

এক-এক দিন রাতে রুস্তম এসে তার শিকল খুলে দিত। এক দিন খাটে না উঠে সোজা দরজা খুলে সরবান্নু চলে এল তার বাপের বাড়ি, গাং-ভেড়ির উপর দিয়ে। এতটুকু তার ভয় করল না।

সেই থেকে তিন বছর সে আছে তার বাপের কাছে। আর এই তিন বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যেও রোস্তম এমুখো হয়নি। খোঁজ খবর নেয়নি। দেয়নি খোরাকপোষাক।

তার বাপ, কছিমদ্দি, জমিজমা খুইয়ে তখন শুধু ভাগচাষী। লাঙল-গরু নেই, মুজরো কবুলতিতে চাষ করে। দিনান্তর খাওয়া হয় না। তারি সংসারে সে কিনা এসে ভাগীদার হল! ছেলে হবার পর খবর পাঠিয়েছিল, যদি এবার ওদের মন টলে। ছেলে মারা যাবার পর আবার পাঠিয়েছিল, যদি বা গলে এবার।

দু'বারই এক তুরুক জবাব: কার না কার ছেলে তার ঠিক নেই।

আর নয়। গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা বললে, 'এবার বিয়ে ছাড়ানোর মোকদ্দমা করো। মারপিট করত, তিন বছরের উপর খোরপোষ দেয়নি, মামলা এক ডাকেই ডিক্রি হয়ে যাবে।'

দুর্বল, মোকদ্দমা করবো কি—কছিমদ্দি চুপ করে চেয়ে থাকে।

'কিছু ভাববার নেই। মোকদ্দমার খরচ আকুঞ্জি সাহেব দেবেন বলেছেন। বলেছেন, বিয়ে ছাড়ান পেলে নিকে করবেন সরবানুকে।' হোমরাচোমরাদের মধ্যে কে একজন বললে।

'আকুঞ্জি সাহেব! কই শুনিনি তো!' মজলিসে সাড়া পড়ে গেল।

'হ্যাঁ, হাঁটানে-ছেলে শুদ্ধু নিকে করবেন না এই ছিল তাঁর গোঁ! ছেলে এবার মরেছে, আকুঞ্জি সাহেবও তাই এগিয়ে এসেছেন।'

তবে আর কথা কি! আকুঞ্জি সাহেবের মত লোক! এত বড় গাঁতিদার! বোর্ডের যিনি প্রেসিডেন্ট! খাঁ-সাহেব হবার জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। তিনি চান সরবানুকে? কছিমদ্দির বুক আহ্লাদে উছলে উঠল।

তবে ডাক দাও এবার দিদার বক্সকে। কছিমদ্দিকে নিয়ে যাক উকিল-সাহেবের সেরেস্তায়। বিবাহবিচ্ছেদের আর্জির মুশাবিদা হোক।

এতটা হাঙ্গামাহুজ্জুত সরবানুর পছন্দ হয় না। মামলা-ফয়সালা করে লাভ কি। তার চেয়ে সবাই যদি ধরে-পড়ে চাপ-চুপ দিয়ে রোস্তমকে রাজি করাতে পারে, মাস-মাস বরাদ্দ কিছু টাকা পাঠাতে, তা হলেই সে বর্তে যায়। রোস্তমদের অবস্থা তো ভালো। বাড়িতে টিনের ঘর, কাঠের খুঁটি। জোন-মান্দার দিয়ে চাষ করায়, গাড়ি-গরু রাখে। অনায়াসেই কটা টাকা ফেলে দিতে পারে। পেটের ভাত, পরনের কাপড়টা অন্তত চলে যায়। নিকে-সাদিতে সুখ কই !

কিন্তু রোস্তম একেবারে কাঠ-গোঁয়ার। টাকাকড়ি তো দেবেই না, বরং উলটে বদনাম দেবে। খাওয়া-পরার চেয়েও মান-ইজ্জত বড় জিনিস। না, আর সে কাকুতি-মিনতি করতে পারবে না। চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এবার দাঁড়াবে সে নিজের জোরে, নিজের অধিকারে। আইনের হাওয়ালায়।

তাই ডাক পড়ল এবার দিদার বক্সের। বাঘের মুখে যেন হরিণ পড়ল। তুষের গাদায় আগুনের ছিটে।

এ অঞ্চলটা উকিল হামিদ সাহেবের প্রতাপের মধ্যে। তা ছাড়া এ বিয়ে-ছাড়ানো মোকদ্দমায় তাঁর মত ওস্তাদ-ওস্তাগর আর কেউ নেই।

ঝুরুলি গ্রামে সমন জারি হল রোস্তমের উপর। এ গ্রাম উকিল হরিসহায়বাবুর জিম্মাদারিতে। তাঁর দালাল হৃদয় ঘোষ রোস্তমকে প্রায় ঘোড়া-ছুটিয়ে নিয়ে এল তাঁর বৈঠকখানায়।

যারা দালাল তারাই মুহুরি। আর এই মুহুরিদের মুঠোর মধ্যেই যত মামলা-মোকদ্দমা। তারা উকিলের থেকে মুনফা নেয়, মক্কেলের থেকে মেহনতানা। তারা আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

রোস্তম জবাব দেয়, সমস্ত ভুয়ো, সমস্ত মিথ্যে কথা। এক-দিনের জন্যেও সে সরবানুর গায়ে হাত তোলেনি, দাবড়ি দিয়ে কথা বলেনি কখনো। লায়লা-মজনুর মত তাদের ভালবাসা ছিল। সমস্ত তার শ্বশুর কছিমদ্দির জালসাজি। বিয়ে ভেঙে দিয়ে নিকে দেওয়াবে। মেয়ে মোটা টাকা পাবে দেনমোহরের, আর নিজেও সে আদায় করবে তহরি। কছিমদ্দি একটি পাকা শয়তান। বড় মেয়ে কুলসমকেও এমনি ভাবে বিয়ে ভাঙিয়ে নিকে দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফায়, সরবানু বাপের বাড়িতে আছে মোটে দেড় বছর। দুই বছর ধরে খোরপোষ না দিলেই তবে বিয়ে ভাঙার একতিয়ার হয়। সেই দুই বছর এখনো পুরো হয়নি। তা ছাড়া যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ওঠা-বসা করে না, কুমতলবে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে, তার আবার খোরাক-পোষাক কি।

তৃতীয় দফায়, আর এইখানেই হরিসহায়বাবুর নিজস্ব খোদকারি, মেয়েটা খারাপ, একেবারে খাস্তা।

তাই যদি, তিন-তালাক দিয়ে দে না। কছিমদ্দির দল রোস্তমের কাছে গিয়ে ঝাপটা মারে। যে মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে তার সঙ্গে আবার পিরিত কিসের? যাক না সে জলে ভেসে।

'না, আমি তালাক দেব না। আমার মান আছে।' রোস্তম গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি বউ-ফিরে-পাবার উলটো মামলা করব।'

সুতরাং দু'-পক্ষে সুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। যন্ত্রতন্ত্র। সাক্ষী সাজানোর কারিগরি। মেয়ের পক্ষে, প্রথমে, মহিম ঘাসী। তিন বছর আগে জ্যৈষ্ঠের এক জ্যোৎস্নারাতে সে সরবানুকে দেখেছিল হেঁটে যেতে, গাং-ভেড়ির উপর দিয়ে, ঝুরুলি থেকে নাগরপুরের দিকে।

'তুমি তখন করছিলে কি অত রাতে?'

'কুটুম-সাক্ষাৎ করে বাড়ি ফিরছিলুম।'

হ্যাঁ, নাগরপুরে কছিমদ্দির বাড়ির থেকে বিশ-কুড়ি রশি দূরেই তার ভিটে। পাড়াসুবাদে সরবানু তাকে নানা বলে ডাকে। হ্যাঁ, একটুখানি অন্তরে-অন্তরে থেকে বাকি পথটুকু এগিয়ে দিয়েছিল মহিম।

উলটো দিকে কাটান-সাক্ষী মমিন গাজি। সে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান। তার গাড়িতে চড়েই কছিমদ্দি তার মেয়ে নিয়ে গেছে, গেল বছর আগন মাসের শেষে। ফসল উঠে যাবার পর টানা মাঠের উপর দিয়ে। আলগা সাক্ষী আছে আরো। সাধু দালাল আর জুড়ন সরদার। এরা কেউ খাতিরখাতরার লোক নয়, চুনের ঘরে সব ধর্ম কথা বলে যাবে।

আরো সব শাঁসালো সাক্ষী আছে রোস্তমের। পাড়া-পড়শী। আলতাপ আর আরমান কারিকর। কেউ এরা

শোনেনি কোনো দিন হুড়-ঝগড়া। খারাপ-মন্দ কথাও একটাও কানে আসেনি। যদি মারপিট হবে তবে চিক্কুড় মেরে কাঁদবে তো মেয়েটা। কোনো একটা টুঁ শব্দও তাদের কানে পৌঁছোয়নি।

কছিমদ্দির দল বলে, ঘরের বউ কি চেঁচিয়ে কাঁদবে নাকি? পাড়া মাথায় করে? সাক্ষী রেখে? সে কাঁদবে গুমরে-গুমরে, বন্ধ বুকের মধ্যে। তা ছাড়া সরবানুর খালু, রাজাউল্লা, নিজের চোখে সরবানুর পায়ে শেকল দেখে আসেনি? ওদের বাড়িতে জন দিত যে গোপাল মোল্লা, সে দেখেনি তার ভাত খাবার মালসা? কাঁদবে কি? মার খেতে-খেতে মারঘেঁচড়া হয়ে যায়নি সে?

দু'পক্ষেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। সাক্ষী ভাঙাবার ফিকির খুঁজছে দু'দলেই। দিদার বক্স আর হৃদয় ঘোষ এসে বিরুদ্ধ তাঁবুতে বসে ফিসির-ফিসির করে। এটা-ওটা তদবির করতে হবে বলে পয়সা নেয়। তারপর একই হাঁটা-পথ দিয়ে পাশাপাশি খোশগল্প করতে-করতে শহরে ফেরে।

হৃদয় বলে, 'মেয়ের ঐ খালু রাজাউল্লো ভারি তেজী সাক্ষী। বড় জোতদার, তাই ইউনিয়ন-বোর্ডের ভাই-প্রেসিডেন্ট। ওকে যদি হাত করতে পারা যায় তা হলে আর কথা নেই।'

ওদিকে দিদার বক্স বলে, 'পাড়ার সাক্ষী একটা খাড়া করা দরকার। এতটা নির্যাতন হল মেয়েটার ওপর, আর পাড়ার

কেউ তা জানতে পারবে না? পাড়ার লোক একাট্টা হয়ে থাকে, কুচ পরোয়া নেই, আমি দাঁড় করাব পাড়ার লোক। এই তো সামনেই আছে ফরিদ মণ্ডল। এমন শেখা শিখিয়ে দেব যে কলকাত্তা বোম্বাই বনে যাবে।'

এদিকে টাকা খরচ করে আকুঞ্জি সাহেব, ওদিকে রোস্তমের চাচা, বশিরদ্দি।

শুনানির দিন পড়েছে, মাস দুয়েক পরে।

এখন কথা উঠেছে সরবানুর জবানবন্দিটা কমিশনে হবে কিনা।

দিদার বক্স বলে, 'বা, কমিশনেই হবে বৈ কি। পর্দানশিন স্ত্রীলোক, সে কি আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে নাকি? কি বলেন আকুঞ্জি সাহেব?'

কখনই না। যত টাকা লাগে আকুঞ্জি সাহেব রাজি।

কিন্তু সরবানু রাজি নয়। সে বলে, 'না, আমি আদালতে, হাকিমের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। উঁচু গলায় বলব আমার দুখের কথা। যারা গরিব, যাদের কেউ নেই, হাকিমই তাদের মা-বাপ।'

অন্তরালে কছিমদ্দি তাকে বোঝাতে আসে। সরবানু ঝিলিক মেরে বলে ওঠে, 'আকুঞ্জি সাহেব আমাদের কে? ওর ঠেঙে টাকা খেতে যাব কেন আমরা? বিয়ে তো এখনো ছাড়ান পাইনি।'

দিদার বক্সের বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ে। কমিশন-জবানবন্দি হলে আরেক কিস্তি পয়সা। উকিল-আমলা-মুহুরি-পেয়াদা। ওর যেন গো-ভাগ্য নয় এঁটুলি ভাগ্য।

'শুনেছ? বাদিনী কমিশন করাবে না। এ যে প্রায় ধান পাকিয়ে মই দিয়ে দিলে!' দিদার বক্স হৃদয় ঘোষের কাছেই নালিশ করে!

'আর বলো কেন!' হৃদয় ঘোষেরও সেই একই নালিশ: 'রোস্তমকে বললাম তোমার মার একটা কমিশন-জবানবন্দী করাও। আর্জিতে তোমার মার নামে বলেছে অনেক নরম-গরম, সাফাই একটা তার দিয়ে রাখ। ছেলে তাতে রেগে প্রায় মারতে আসে। বলে, আমাতে-ওতে কাণ্ড, তাতে আবার মাকে টানো কেন?'

'আমি ভয় খাইয়ে দিয়ে এসেছি কছিমদ্দিকে। বলেছি, মেয়ে তোমার আদালত-আদালত করছে, ভিড়ের মাঝে হকচকিয়ে গিয়ে সব শেষে ভণ্ডুল করে দেবে।'

'আমিও ছেড়ে দিইনি। বলে এসেছি, তোমার মা যদি না নিজের মুখে আর্জির কথা অস্বীকার করে, তবে আর দেখতে হবে না। মামলা নির্ঘাত ডিক্রি হয়ে যাবে।'

দুই বন্ধু পাশাপাশি হেঁটে যায়। মুখের কাছে মুখ এনে এক কাঠিতে বিড়ি ধরায় দুজনে।

দু'পক্ষই ভয় পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কেননা আপোষ-নিষ্পত্তির কথা উঠেছে একটা। দশ-সালিশ ডেকে মিট করিয়ে ফেল। গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা নিজের থেকেই মজলিস ডেকেছে।

দু'পক্ষেরই ভয়। সরবানু যদি জেতে, তবে রোস্তমের মান যায়, মুখ পোড়ে। দেনমোহরের বাজার চড়ে যায় দেখতে-দেখতে। বউ-কাঁটকি বলে মার অপবাদ হয়। আর, যদি রোস্তম জেতে, তবে জন্মের মত সরবানু অন্নদাসী হয়ে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ায়। মামলার ফলাফল কিছুই বলা যায় না, তরাজু কখন কার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই দু'পক্ষই সায় দেয়, উস্কে দেয় সালিশবাবুদের।

সালিশের সর্ত খুব সোজা। রোস্তম সরবানুর বরাবর একটা তালাকনামা সম্পাদন করে দেবে আর তার পণস্বরূপ সরবানু দেবে তাকে পঞ্চাশ টাকা।

মন্দ কি। ভাবলে রোস্তম। যে মেয়ে বশ মেনে থাকতে চায় না, কি হবে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে? দূর করে দিয়ে নতুন বউ ঘরে আনবে। মন্দ কি, মাঝের থেকে পঞ্চাশ টাকা রোজগার। পড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনাই লাভ।

মন্দ কি। ভাবলে সরবানু। যে ভাবে হোক বিয়ে ছাড়ান পেলেই হল। আখোচ করে কি হবে। গায়ে এখন আর কোনো দাগ-জখমও নেই; জ্বালা-যন্ত্রণার ঝাঁজও এখন মুছে

গেছে মনের থেকে। টাকা কে দেয় না দেয় তার খোঁজে তার কি দরকার। ছেলে একটা তার অনাদরে মরে গেছে বটে,. কিন্তু তাই বলে তার শরীরের জোর মরে যায় নি।

আপোষ-রফার কথা উঠতেই আরেক মহলে আগুন জ্বলে উঠল। হৃদয় ঘোষ-দিদার বক্ষ নয়, এবার আসল ঠাকুরের স্থান। আগুন জ্বলে উঠল হরিসহায়বাবু আর হামিদ সাহেবের জঠরে। আপোষ হওয়া মানেই গোড়া ধরে গাছ কেটে ফেলা। এ বজ্রপাত মাথা পেতে সইবেন না তাঁরা কখনো। অন্তত পঁচিশ টাকা করে না পেলে তাঁরা ছোলেনামায় দস্তখৎ দেবেন না।

এমনিতে দু'টাকা পেলে যাঁরা টঙে ওঠেন তাঁদের হাঁকার আজ, পঁচিশ টাকা। মক্কেলের আপোষ আর উকিলের আপশোষ। উপায় কি, কুড়িয়ে খেতে না পেলেই কেড়ে খেতে হয়।

উকিলরা ঘাড় বেঁকায় দেখে পক্ষরাও পিছিয়ে পড়ে। দু'দিক থেকে হৃদয় ঘোষ আর দিদার বক্স শক্ত হাতে পাঁচন কষতে থাকে। শুধু উকিলের সই? মুহুরিয়ানা নেই? আমলায়ানা?

আর, দুর্বল ছাড়া আপোষে রাজি হয় কে? মোকদ্দমায় যার যতখানি জিদ তার ততখানি জিত।

সালিশরা ছোড়ভঙ্গ হয়ে যায়। পক্ষরা আবার নিজের-নিজের কোটে ফিরে গিয়ে ঘোঁট পাকায়।

সত্যি, কোনো মানে হয় না। রোস্তম মনে-মনে বলে। আপোষ হয়ে গেলে শ্বশুর কছিমদ্দি জব্দ হয় না। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয় না সরবান্নুর। রোস্তমের কি। একটা ছেড়ে চারটে পর্যন্ত সে বিয়ে করতে পারে। গায়ে পড়ে তালাক দিতে যাবার তার কি হয়েছে?

সত্যি, কোনো মানে হয় না। এ সরবান্নুরও মনের কথা। সে আদালত করেছে, আদালতই তাকে আশ্রয় দেবে। এমন দাঙ্গাবাজের সঙ্গে আবার আপোষ-রফা কি। লাথি-চড় মেরে না খেতে দিয়ে শরীরের জৌলস কেড়ে নিয়েছে, তার উপরে এই বেইজ্জতি! বলে, কার ছেলে কে জানে। তাকে আবার টাকা দিয়ে তোষামোদ করা! কখনো না।

হৃদয় ঘোষ আর দিদার বক্স আবার বিড়ি ধরিয়ে শহরে ফেরে।

সরবান্নু সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়।

গায়ে-মুখে বোরখা নেই। আলগা একটা ছোট কাপড় গায়ের উপর চাদরের মত করে ভাঁজ করে নিয়েছে। মাথার কাপড় মাথা থেকে এক চুলও নেমে আসেনি। চোখ দুটো টলটল করছে। অনেক কথা বলে ফেলার অধৈর্যে।

'কি উকিল সাহেব,' হাকিম জিগগেস করলেন এজলাস থেকে, 'মামলা মিটিয়ে ফেলুন না।'

সরবান্নু ঝংকার দিয়ে উঠল: 'জীবন বিসর্জন দেব তবু মামলা মিটিয়ে নিতে পারব'না ওর সঙ্গে।'

রোস্তমের দল হরিসহায়বাবুর পিছন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বে-আব্রু হয়ে সাক্ষী দিতে এসেছে, সরবানুর এই বেহায়াপনায় রোস্তম প্রথমটা তর্জন করে উঠেছিল—তার স্ত্রী হয়ে এই অশিষ্টতা! কিন্তু বেগতিক হয়ে তাকে ঠাণ্ডা হতে হয়েছে—সরবানু আর তার স্ত্রী থাকতে রাজি নয়। সে বেছপ্পর, তাই সে বে-পরদা।

লম্বা জবানবন্দি হচ্ছে সরবানুর। রঙ কলিয়ে তার মারের কাহিনী বলছে। তার না-খেতে পাওয়ার কাহিনী। গলাটা বড্ড খরখরে, স্পষ্ট। এতটুকু থামে না, দমে না। জায়গা বদলায় না। সত্যের সুর যেন এসে কানে লাগে।

তারপর ছেলের কথা উঠল। এবার সরবানু ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। এ একেবারে তার আরেক রকমের চেহারা। বর্ষার আকাশের মত। কাঁদতে যদি একবার সুরু করল, আর থামতে চায় না। কেবলই বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। শরীরটা ঝাঁকানি খেয়ে কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

বড় রোগা হয়ে গেছে সরবানু। অনেক জুড়িয়ে গেছে তার গায়ের রঙ। ডান ভুরুর উপরে মারার সেই কালো দাগটা কেমন করুণ করে রেখেছে তার চোখের চাউনিটাকে। হাতে শুধু দুগাছা গালার চুড়ি। খালি পা। পরনের শাড়িটা মোটা, আধ-ময়লা। বুকের থেকে, কোলের থেকে দুই বাহুর মধ্যে থেকে কি যেন চলে গিয়েছে এমনি একটা খালি-খালি ভাব।

জেরায় উঠে হরিসহায়বাবু প্রথমেই ছেলের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে একটা জট পাকিয়ে তুললেন। তার সঙ্গে বিয়ের তারিখ, বাপের বাড়ি যাবার তারিখ, আর্জি-দাখিলের তারিখ সব একত্র করে, বাধিয়ে দিলেন গোলমাল।

ধাঁধা লেগে গিয়েছে সরবানুর। ভুল করে ফেলছে। উলটা-পালটা বলছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে। এমনি করলে মামলা সে জিতবে কি করে? তার জন্যে কষ্ট হয়। মায়া করে।

'আফটার দি রিসেস।' হাকিম হঠাৎ কলম রেখে খাস-কামরায় নেমে যান।

এক জেরাতেই মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে—রোস্তমের দল খুসি হয়ে ওঠে।

আধ ঘণ্টা পর হাকিম আবার উঠে আসতেই মামলার ডাক পড়ে। হাজিরার সব সাক্ষীই আছে, শুধু সরবানু আর রোস্তমকেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারা ততক্ষণে টাবুরে নৌকোয় করে ইছামতীতে ভেসে পড়েছে।

তাদের জীবনে এমন একটা দিন কোনো দিন আসেনি। তাদের চার দিকে উকিল-মুহুরি আমলা-ফয়লা সাক্ষী-সাবুদের ষড়যন্ত্র, তারি মধ্য থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে তারা। চলে এসেছে নদীর উপর, ঝকঝকে আকাশের নিচে। আর কে

তাদের ধরে। যদি ধরে, জলে লাফিয়ে পড়বে তারা, সাঁতরে পার হয়ে যাবে।

'খোকাকে কোথায় গোর দিয়েছিস ?' জিজ্ঞেস করে রোস্তম।

'বাগানে।' রোস্তমের কাঁধের কাছে মুখ গুঁজে সরবানু ফুঁপিয়ে ওঠে।

'বাগান ? বাগান কোথায় ?'

'নামে বাগান। আওলাত-ফসল কিছুই নেই। শুধু একটা গাব গাছ। সেই গাব গাছের তলায়।'

'চল্, দেখে আসি।'



আগে গায়ে শক্তি ছিল। গাছে উঠে নারকেল চুরি করত। নৌকো করে মাছ চুরি করত গাঙে গিয়ে। জবরদস্তি ধান আনত কেটে।

তখন গায়ে শক্তি ছিল।

তখন কেউ তাড়া করলে ছুটতে পারত উর্ধ্বশ্বাসে। ধরা পড়ত না। এখন পারে না ছুটতে। একটুতেই ধরা পড়ে যায়।

সবাই আগে তাকে চোর বলত। যখন হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যেত রাস্তা দিয়ে। সবাই সমীহ করে তাকাত তার দিকে। একটু ভয় করত বা মনে মনে।

এখন তাকে একেবারেই কেউ ভয় করে না। চোর বলে না, বলে, ছ্যাঁচোড়। এখন তাকে গামছা বেঁধে টেনে নিয়ে যায়।

ছ্যাঁচোড় নয় তো কি। শেষকালে ঢুকল কিনা রান্নাঘরে। বাসন চুরি করতে নয়, ভাতের সন্ধানে।

হাঁড়িতে জল দেয়া। হাত ঢুকিয়ে দেখল ছাড়া-ছাড়া ভাত রয়েছে কতগুলি। অন্ধকারে হাতের স্পর্শে টের পাওয়া যায় স্পষ্ট। হাঁড়িটাকে প্রায় কোলে নিয়ে বসল মস্তাজ।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল ফেলে কণা কণা ভাতগুলি মুখে তুলে দিতে লাগল। ছোট ছোট দুই গ্রাসেই শেষ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। শেষকালে মন্তাজ দু' হাতে হাঁড়িটাকে তুললে মুখের উপর। হাঁড়ির তলাকার জল খেয়ে ফেলল এক চুমুকে।

কিন্তু এই খাওয়াই কি মন্তাজের শেষ খাওয়া?

না, জেলে যেতে আর ইচ্ছে করে না তার।

তাই একখানা থালা তার জোর করেই টেনে নিতে হয়। আর নিতে না নিতেই শব্দ করে ফেলে ইচ্ছে করে।

ঝনঝনঝনাৎ।

মন্তাজের মনে পড়ে শেষ থালাখানা যখন সে বেচে আসে হাটের পোদ্দারের কাছে।

হৈ-হৈ করে ছুটে এল সবাই। কিন্তু এবার তাকে ধরল না। মারধোর করল না। পুলিশে দিল না।

বরং বললে, 'আহা বেচারা, খেতে পায়নি কত দিন।'

অথচ খেতে দেয় না কেউই পেট ভরে। ব্যবস্থা করে দেয় না। শুধু মুখেই বলে, আহা।

তালপাতার দোচালা ঘর, বাঁশের চেরা দিয়ে বাঁধা। বাঁশের খুঁটি, বাঁশের আড়া। নলখাগড়ার বেড়া, একদিকে বা হোগলা-পাতার। দীঘে-পাশে চার-পাঁচ আঙুল ফাঁক। হাওয়া ঢোকে হি-হি করে। দুয়ার-কপাট নেই, বাঁশের ঝাঁপ ঝুলছে একখানা।

গায়ে কাপড় নেই, দুধের ছেলেকে বুকে নিয়ে কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হয়ে শুয়ে আছে মইফুল।

শুয়ে আছে ন্যাড়া একখানা হোগলার উপর। ঘরের এক-ধারে একটা মাচা, তার উপরে তাদের অস্থাবর মালামাল। হাঁড়িকুঁড়ি খুরিখোরা। কোনটাতে দু-এক সের ধান, কোনটাতে সামান্য খুদকুঁড়া, কোনটাতে এক-আধসের কড়াইর ডাল, কোন-টাতে বা ক'টা হলুদ-মরিচ। পাশে শিকেয় টাঙানো বোতলে খানিকটা কড়ুর তেল; খানিকটা লাল কেরাসিন, নারকোলের মালাতে একটু বা নুন। কোনদিন যদি বা মিঠে কুমড়ো বা পাকা শশা মিলে যায়, তার মাথায় চুন মেখে শিকেয় টাঙিয়ে রাখে। ঘরের মধ্যেই রান্না করবার উনুন, পাশে শিল পাতা। উনুনের কাছে একটা হাঁড়ি বসানো, হাঁড়ির মধ্যে জল। রান্নার আগে এক মুঠো করে চাল হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দেয় মইফুল। চাল যখন পচে ওঠে, গন্ধ বেরোয়, তখন সেই চালে পায়েস রাঁধে। বলে, কাজির জাউ। সবাই তৃপ্তি করে খায়। মন্তাজ আর মইফুল, তাদের ছেলেমেয়ে।

পরের বাড়িতে হালিয়ার কাজ করে মন্তাজ। বোশেখ থেকে আশ্বিন। নগদ দশটা টাকা, বারো মণ ধান, দুখানা লুঙ্গি, দুখানা জল-গামছা—এই তার ছ' মাসের মাইনে। যে বাড়িতে কাজ করে সেই বাড়িতেই তাকে রাত কাটাতে হয়। চার-পাঁচ দিন অন্তর একটা রাতের ছুটি পায় ঘরে শুতে। সে রাতে

মইফুল একটু আলাদা করে রাঁধে, ঝাল একটু বেশি দিয়েই স্বাদটা জোরালো করে।

বাঁশের চোঙে তামাক, হাঁড়িতে তুষের আগুন। খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেপিলে সবাই মিলে এক কলকি তামাক টেনে যার যার জায়গায় শুয়ে পড়ে। বৃষ্টি পড়ে ঝুপঝুপঝুপ। মন্তাজ আর মইফুলের চোখে ঘুম আসে না। মাইনে বাবদ আগাম যা নিয়ে এসেছিল কবে ফুরিয়ে গেছে—ভাবে, বাকি ছ মাস তাদের কাটবে কিসে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর হতে না হতেই এক কলকে তামাক টেনে নিজের কাজে চলে যায় মন্তাজ। ছেলেপিলেগুলোকে জলভাত খাইয়ে পাঠিয়ে দেয় মইফুল—মেজটাকে বাপের সাহায্যে, বড়টাকে মাছ ধরতে হাতড়ে, ধারাধারি খালে-নালে, বিলে-বেড়ে। নিজে বাটনা বাটে, হঁড়ি-পাতিল ধোয়, জল আনে, কটা হাঁস-মুরগি আছে তার হেপাজত করে, কোলের ছেলেটাকে বুকের দুধ খাওয়ায়। খাওয়াদাওয়া সারা হয়ে গেলে হাওলাদার সাহেবের বাড়ি যায়, ভানাকুটা করে, সেদ্ধ করা কাপড় কেচে দেয়, খই ভেজে দেয়, কাঁথা সেলাই করে, গিন্নিদের মাথা খোঁটে। এতে কোন দিন কিছু চাল পায়, ভাত পায়, কোন দিন কিছু চাল-ভাজা আনে, খই আনে, লবণ আনে। কোন দিন কাজ কিছু না জুটলেও দু-একটা পান, কটা সুপুরি, কিছু সাদাপাতা চেয়ে

আনে। কোন দিন বা গিন্নিকে বেশি একটু খাতির দেখিয়ে নিজের মাথায় নারকোল তেল ঘসে আসে।

সেদিন মেজ ছেলেটাকে দিয়ে মন্তাজকে খবর পাঠায়। বলে, বাজানকে আসতে বলিস ঘরে।

ঘরের পুরুষ ঘরে আসে সেদিন। আসে খুসবু-র রাত।

দেখতে দেখতে আশ্বিন মাস কাবার হয়ে যায়। কেরায়া খাটার দিন যায় ফুরিয়ে। আসে জ্বর-জ্বালা। কুইনিনের বদলে লাটাফল। কেউ কাউকে হদিস করার নেই। শটির পালো দূরের কথা, পচা পানি-ভাত আর পোড়ামরিচও জোটানো যায় না।

তখনই মন্তাজ চুরি করে।

হাঁস-মুরগিকে শামুক-গুগলি ধরে খাওয়ায়, কিন্তু নিজের আণ্ডাবাচ্চাকে খাওয়াতে পারে না। তখনই রাত করে বেরোয় চুরি করতে। মইফুল নারকোল তেল মাথায় ঘসে এলেও সে-রাত সে বাড়ি থাকে না। অন্ধি সন্ধি খুঁজে বেড়ায়।

চার-পাঁচ বার ঘুরে এসেছে সে জেল থেকে। এক-একবার যায়, ফিরে এসে দেখে, সন্তান একটা মরে গেছে। শেষবার এসে দেখে মইফুল নেই। জ্বরে পুড়ে ঠাণ্ডা হয়ে চলে গেছে মাটির নিচে।

এখন আর তার চুরি করার দরকার কি। কার জন্যে চুরি করবে? মইফুল বলত, 'আমাদেরই বদ নসিব, তুমি কেবল ধরা

পড়ে যাও। ঐ দেখ দেকি, চাঁদ মিয়া কেমন চাল-ডাল, তেল-নুন চুরি করে এনে বিক্রি করছে হাটে বসে, কেউ ধরতে পারছে না—'

'ঐসব ভদ্র চুরিতে পয়সা লাগে। আমরা যে জাত-কাঙাল।'

না, আর চুরি করবার দরকার নেই। নিজের একটা পেট চালাবার জন্যে তার আর বেশি ভাবতে হবে না। কিন্তু, আশ্চর্য, নিজের জন্যেই ভাত চুরি করতেই কিনা ঢুকল শেষকালে রান্নাঘরে।

কর্জ-দাদন দিচ্ছে।

মহল্লার চৌকিদার তদন্তে এসেছে। রহমালি চৌকিদার। কোমরে চাপ, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি। তার চোট-চাপট কত!

'পঞ্চায়েৎ', মন্তাজ সসম্ভ্রমে সম্বোধন করে রহমালিকে, 'আমাকে কিছু পাইয়ে দিতে পার?'

মন্তাজের দিকে একবার কৃপার চোখে তাকায় রহমালি। বলে, 'তুই তো চোর।'

অনেকক্ষণ মুখে কোন কথা আসে না মন্তাজের। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

একদিন রাতে সে গিয়েছে হালিয়ার কাজে, রহমালি তার বাড়ি এসেছিল দাগী-তালাসে। দেখতে, সে বাড়ি আছে, না বেরিয়েছে চুরি করতে। মইফুল যত বলে মুনিবের বাড়ি আছে,

রহমালি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। বাঁশের গায়ে ফুটো করে দু' একটি করে পয়সা জমাত মইফুল। ঘরের সেই বাঁশ কেটে দুটি টাকা সে বের করে দেয় রহমালির হাতে। থানায় আর রিপোর্ট যায় না।

আমি একাই চোর। আর তুমি পীরপেগম্বর।

'ও লোন না পেলে খাবে কি? আবার তো সেই চুরি করবে।' ওর হয়ে ওকালতি করে জয়নদ্দি মাস্টার।

'লোন দেব যে ওর খানা আছে? চৌকিদারি ট্যাক্সো আছে? জমি-জিরাত আছে? ও শোধ করবে কোত্থেকে? হাল-গরু নেই, নাম-নিশানা নেই, ও তো চোর।'

'কিছু নিয়ে-টিয়ে যদি হয়—'

নেবে তো সে বটেই, সে কেন, বড় মিয়া প্রেসিডেন্ট সাহেবকেও দিতে হবে হাত ভরে। এ তো গোড়ার কথা। কিন্তু সরকারী টাকাও তো শোধ করতে হবে। মন্তাজের সেই মুরোদ কই। ওকে তো কাটলেও এক ফোঁটা রক্ত পাওয়া যাবে না। শেষকালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ুক আর কি।

'কিন্তু কিস্তি খেলাপের আগেই দিন তো ফিরে যেতে পারে।'

না, তার চোখে সূর্যের আলো থাকতে-থাকতে দিন আর ফিরবে না। মন্তাজ ক্লান্তিতে চোখ বোজে।

পরস্পরের জামিন হয়ে এক সঙ্গেও মুচলেকা দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কেউই মন্তাজের জন্যে জামিন দাঁড়াতে রাজি নয়।

যাদের গরু নেই, মরে গেছে গুটির ব্যারামে, তাদেরো দেয়া হবে কর্জ। মন্তাজ ক্ষণিকের জন্যে গরু থেকে মাঠ, মাঠ থেকে বাড়ি ও বাড়িতে মইফুল—একটা সৌভাগ্যের ঝিলকি দেখে, কিন্তু গরুর জন্যে তারাই লোন পায় যাদের গরু আছে। যাদের গরু আছে তারাই দিতে পারে ঘুষ। কেউ কেউ বা গরুর টাকা দিয়ে মোষ কেনে।

মন্তাজ এবার ক্ষেতে ঢুকে শশা-কাঁকুড় চুরি করে। ধরা পড়লেও তাকে কেউ পুলিশে দেয় না। তার চুরিতে আর জেল্লা নেই। সে এখন গরু ভেড়ার সামিল।

কিন্তু, না, তারো দিন বুঝি ফিরল। সবাইরই দিন বোধ হয় একদিন ফেরে।

গাঁয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা হচ্ছে। আর বেছে বেছে তেমন সব কুলি নিচ্ছে যারা মন্তাজের মত নিঃসম্বল।

আশ্চর্য, এমন কাজও আছে, যেখানে তাদের মত লোকের ডাক পড়ে। সব্বাইর আগে ডাক পড়ে। তারাও নিজেদের মনে করে উপযুক্ত বলে।

হ্যাঁ, তাদের জন্যেই তৈরি হচ্ছে রাস্তা। তাদেরকে জীবিকা দিতে।

এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পাহারাওয়ালা সাদা হাড়ের নিশান দেখিয়েছে। গত সন ভাল বৃষ্টি হয়নি, ধান হয়নি মনের মত। যা-ও হয়েছে বিলি-মজুতের গোলমালে ছানভান হয়ে গেছে।

না, এবার আর ফাঁস খুলতে দেয়া হবে না কিছুতেই। প্রত্যেকের মুখেই ভাতের গরস উঠবে এবার।

একেবারে নিরবচ্ছিন্ন দান নয়। সে দানে ভিক্ষের চেহারা। ভিক্ষুকের মলিনতা, ভিক্ষুকের আলস্য। না, তাদের মর্যাদাবান হতে হবে। খেটে খাবার মর্যাদা। আর এমন সে-খাটনি, যাতে গাঁ-ভোর তাদের সকলের উপকার। সকলের মঙ্গল।

টিনের চোঙের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দেয় পাবলিসিটি অফিসর।

এ গ্রামে রাস্তা নেই একটাও। হাটে-বন্দরে যাবার রাস্তা নেই, জাহাজঘাটে যাবার রাস্তা নেই, রাস্তা নেই কবরখোলার দিকে। এবার সরাসর রাস্তা হবে তাদের জন্যে। রাস্তা হলেই বদলে যাবে গ্রামের চেহারা। বারোমেসে দোকান-দানি বসবে, আস্তে আস্তে ইস্কুল বসবে, হাসপাতালই বা বসবে কিনা তা কে বলতে পারে। রাস্তা হলেই দোস্তি-মহব্বতি হবে সবাইর সঙ্গে; চুরি-ডাকাতি কমে যাবে। রাস্তা হলেই সাহেবসুবোরা ঘন ঘন এসে তাদের তদবির-তালাস করতে পারবেন।

টিনের চোঙ চলে যায় এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়, এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো। আড়কাটির কাজ নিয়েছেন রোড-সরকার আমাদের বলাইবাবু।

'আমি মজুরি পাব বাবু?'

'কি করিস তুই? হাল-হালটি আছে?'

'না বাবু।'

'কি করে খাস তবে?'

'খাটা-খাটনি করে।' বলতেই মন্তাজ মুখ নামাল।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জহরদ্দি। তার সঙ্গে অনেক দিনের শক্রতালি। বলে উঠল, 'খাটা-খাটনি না আর কিছু! সাত-সাতবার বেরিয়েছে জেল থেকে। শেষবার চুরি করেছিল ঠাকুর গাজীর চাঁদকপালে গরুটা।'

কোথায় ঝাঁজিয়ে উঠবে মন্তাজ, তা না চুপ করে থাকে। এটা যেন রাগের কথা নয়, দুঃখের কথা।

জহরদ্দির নিজের জমি জায়গা আছে। কিন্তু খন্দ উঠে গেলে পর সেও চুরি করে। কিন্তু বরাত ভাল, ধরা পড়েনি এ পর্যন্ত। একবার শুধু হাজতে ছিল পনেরো দিন।

সে অনেক মানী চোর। তার সঙ্গে হেতের-শাবল থাকে, ল্যাজা-সড়কি। সে সিঁধ কাটে, বেড়া কাটে। তার অনেক রপট-দাপট। সে মন্তাজের মত ছিঁচকেমি করে না। একেবারে মোটা মাল নিয়ে আসে। বারে বারে ঘুরে ঘুরে চুরি করতে হয় না তাকে। দারোগাকে ঘুষ দেবার মত তার পয়সা থাকে।

'চুরি করে তো—তা, ওর দোষ কি?' বলাইবাবু প্রায় ধমকে ওঠেন।

কথাটা কি রকম যেন অবিশ্বাস্য শোনায়। তার দোষ

নেই। মন্তাজের নিজেকে কেমন যেন নতুন বলে মনে হয়। সব কিছু যেন নতুন লাগে।

'কাজ পায় না, চুরি করবে না তো কি! কাজ পেলে ককখনো ও চুরি করতো না। কি রে, কাজ পেলেও চুরি করবি?'

'ককখনো না।' সমস্ত শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মন্তাজ। সমস্ত ভার যেন নেমে যায় কাঁধ থেকে।

'যাদের কাজ আছে, খাবার যাদের ভাবনা নেই, তারা যদি তবু চুরি করে, তারাই দুষি, তাদের জেল হওয়া উচিত।' বলাইবাবু সস্নেহে তাকালেন মন্তাজে দিকে: 'মন্তাজের কি দোষ!'

ইহসংসারে কেউ শোনায়নি তাকে এমন কথা। সত্যিই সে অপরাধী নয়, সে পাপ করেনি। স্বচ্ছল কাজ পেলে কখনই তাকে চুরি করতে হত না। সে গৃহস্থি করত। যত নিচু-দরের হোক একটা স্বত্ব নিয়ে জমি চাষ করত, শুধু কিষান হয়ে কেরায়া খাটত না। কাজ পায় না বলেই সে নির্লজ্জের মত চুরি করে। আর, ধরা পড়লে আরো বেশি লজ্জা পায়। মইফুল কত আপশোষ করেছে তার জন্যে।

না, তারো দিন ফিরল। বলাইবাবু তাকে কাজ দিয়েছেন। রাস্তা তৈরির কাজ।

'আর এ শুধু নিজের একার স্বার্থে কাজ নয়', পাবলিসিটি অফিসর চোঙে ফুঁ দিতে থাকে: 'সমস্ত দেশের জন্যে কাজ।

এই কাজের মধ্য দিয়ে সবাই একত্র হবে, আর এই একত্র হওয়ার মধ্যে দিয়েই বুঝবে তোমরা নিজের গ্রাম, নিজের দেশ।'
কাঁচা মাটির রাস্তা। খাদ কেটে মাটি তোলা হচ্ছে। এক-এক কুয়ো মাটি ধরে মজুরি। আড়ে দীঘে ষোল হাত, খাই আড়াই হাত, এই মাপের কুয়ো। এক-এক কুয়োর পিছনে দু'জন করে মজুর। এটা গরুর গাড়ির দেশ নয়, তাই একজন কোদাল মেরে মাটি ঝাঁকায় তোলে, আরেকজন মাথায় করে বয়ে এনে সেই ঝাঁকাশুদ্ধু মাটি ঢেলে ফেলে রাস্তার উপর। তার পরে, অনেক পরে, দুরমুস করে। দুজনে এক দুপুর, ছ'ঘণ্টা করে খাটে। কুয়ো বুঝে মজুরি পায়।

মন্তাজ আর জহরদ্দি এক দলে পড়েছে। তাদের সমস্ত ঝগড়া আর মনোবাদ দূর হয়ে গেছে। এ মাটি কেটে ওর মাথায় তুলে দেয়, ও মাটি কেটে এর মাথায় তুলে দেয়। কখনো এ নেয় কোদাল, ও নেয় ঝুড়ি; কখনো ও নেয় কোদাল, এ নেয় ঝুড়ি। কেউ আর কাউকে চোর বলে হেনস্তা করে না। দু' জনেই তারা সমান। দু' জনেই তারা শ্রমিক। দু'জনেই তারা তাদের গ্রামের জন্যে, দেশের জন্যে কাজ করছে।

নিজেকে মন্তাজের অনেক বেশি ভাল লাগে। অনেক বেশি দামী মনে হয়। অনেক বেশি উপযুক্ত। সে যেন এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে। চুরি না করে এত দিন সে মাটি কোপায়নি কেন? কেন রাস্তা করেনি দিকে দিকে?

সে গ্রাম বোঝে, কিসমৎ বোঝে, মৌজা বোঝে, কিন্তু দেশ ঠিক বোঝে না। আবছা আবছা বোঝে, সে একটা কি প্রকাণ্ড জায়গা, অনেক লোক, অনেক হৈ-চৈ। তার যখন দেশ, তখন সেও সেই জনতারই একজন, এমনি একটা বন্ধুতার অনুভূতি তার মনে আসে। মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

ঠিক বোঝে না, তবু এটুকু বোঝে সে একটা খুব বড় কাজ করছে। খুব বড় কাজ বলে সবাই বলছে দেশের কাজ। সে স্পষ্ট দেখতে পায় ও-রাস্তা দূর থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে আকাশের কিনারে। একেবারে সূর্যের ঘরের দুয়ারে। সোনার রথে চড়ে সূর্য নামবেন এই কাঁচা মাটির রাস্তায়। আসবেন তাদের কাঙালের আঙিনায়।

ঠিক এমনি করেই সে বোঝে না; তবু যা সে বোঝে তাতে তার ভারি সুখ হয়, সাহস হয়। মনে হয়, তাকে আর চুরি করতে হবে না, সে স্বত্ব পাবে জমিতে, ভাদ্রে আর অঘ্রানে ধান পাবে অজস্র, তার মইফুল ফিরে আসবে, বুকের দুধ খাওয়াবে তার নতুন সন্তানকে।

'কি করছিস আজকাল?' পাশ-গ্রামের এলেম মাতব্বর জিগ্‌গেস করেছিল।

মন্তাজ বলেছিল গম্ভীর মুখে, 'দেশের কাজ করছি।'

একটা বড় চুরিতে মন্তাজকে সাগরেদ নেবে ঠিক করেছিল এলেম। কিন্তু কথাটা পাড়বে এমন তার সাহসই হল না।

দেশের কাজের মন্ত্রে মস্তাজের শোধন হয়ে গেছে। তার বদল হয়ে গিয়েছে আগাগোড়া।

মস্তাজ মাটি কাটে, ঝুড়ি ফেলে, দুরমুস করে, আর এক-পা এক-পা করে এগোয়। তার দেশ ক্রমশ বড় হতে থাকে।

ফিনানসিয়াল ইয়ার ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। তার আগেই বলাইবাবুকে বিল সাবমিট করতে হবে। কিন্তু তার আগে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট দরকার।

রাস্তা আদ্ধেকও হয় নি। না হোক। তার জন্যে সার্টিফিকেট পেতে বাধা নেই।

সার্টিফিকেটের যিনি কর্তা তাকে ভারি হাতে ঘুষ দিলেন বলাইবাবু। বেরিয়ে এল সার্টিফিকেট। আর তার বনিয়াদে বিল পাশ হয়ে গেল।

কোটে-শার্টে বলাইবাবুর সাত সাতটি পকেট ঠেলে ফুলে বোঝাই হয়ে উঠল।

আরো অনেক অসমাপ্ত রাস্তার মত এই রাস্তাটিও অর্ধপথে থেমে রইল। কটা দিন মাটি মাটি মনে হবে, পরে যাবে নিঃশেষে ধূলিলীন হয়ে।

যাবার সময় বলাইবাবু মস্তাজের কাঁধ চাপড়ে আদর করে বললেন, 'অনেক কামিয়েছিস এ কদিন। এ বছর আর চুরি করতে হবে না আশা করি। চাষী লোক, চুরি করবি কেন? ছি!'

অসমাপ্ত রাস্তাটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেই মুখে মন্তাজ এসে দাঁড়ায়। একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার মত। সামনে শূন্যের দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশব্দ চীৎকার তার বুকের মধ্যে গজরাতে থাকে—রাস্তা নেই, নেই আর রাস্তা।

সামনে কাঁটা বন। আর তার দু'নল উত্তরেই কবরখোলা।



ডাক্তারের ডাক পড়ল।
হুকুমালি তালুকদারের বড়
ছেলে আক্কেলালির জ্বর।

একজনের গায়ে দুই জনের জ্বর। এত প্রবল।

বললে, 'ডাক ডাক্তারকে।'

ফকিরফোকরার তোয়াক্কা রাখেনা হুকুমালি। সে লেখা-পড়া জানে না বটে, কিন্তু তার বিস্তর অবস্থা। তার জমি-জায়গা অঢেল, গরু-মোষ অনেকগুলি। যারা গরিব, উমি লোক, ক্ষুদ্দুর প্রজা, তারাই ফকিরফোকরার খবর করে। ডাক্তার না ডাকলে হুকুমালির মান থাকে না।

অবস্থার গুণে হুকুমালির এটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে তুকতাকে ব্যামো সারে না। ব্যামো সারে ওষুধে। আর, কোন ব্যামোয় কি ওষুধ লাগে, বলতে পারে ডাক্তার। তা ছাড়া, শহরে দেখে এসেছে হুকুমালি, যারা বড়লোক তারা দরগায় গিয়ে সিন্নি মানে না, ডাক্তার ডাকে।

হুকুমালি ডাক্তার ডাকল।

তিনখানা গাঁয়ে একজন ডাক্তার। ডাক্তার আমাদের

শুকলাল বারিক। আগে শহরে কম্পাউণ্ডারি করত। ফেল-করা কম্পাউণ্ডার। হাতে-হেতেরে কাজ শিখে নিয়ে এখন বুক ঠুকে এই বন-বাদায় বসে ব্যবসা করছে। নাপিতের কাছ থেকে ফাড়নচিরন শিখেছে এমন দুয়েকজন নরুনে কবরেজ আছে, কিন্তু ডাক্তার বলতে একা শুকলাল। আস্ত এক টাকা ফি।

'ফাড়তে পারে বটে, কিন্তু ফুঁড়তে পারে না।' কবরেজদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা শুকলাল।

আর, শুকলাল ছাড়া কে সার্টিফিকেট দেবে শুনি? কবরেজরা তো সব টিপ-পণ্ডিত, লিখতেই পারে না, সার্টিফিকেট দেবে কি! সাক্ষীদের কেউ গেছে ভূঁই রুইতে, কেউ গেছে হাটে সওদা নিয়ে, মোকদ্দমার মুলতুবি চাই। নিমুনিয়া, কলেরা, ব্রঙ্কাইটিশ, ডায়রিয়া—ঠিক-ঠিক বানান করে সার্টিফিকেট লেখে শুকলাল। নামের আগে জাঁকালো করে ডাক্তার লেখে। সব মুসাবিদা তার মুখস্থ। এমনভাবে বিতং দিয়ে লেখে যে কেউ খুঁত। ধরতে পারে না। যদি কখনো অগ্রাহ্যও হয়, তবে ফের মোকদ্দমার শুনানির সময় মোকাবিলা সাক্ষী হয়ে আরেক দফায় রোজগার করে।

তা ছাড়া ও-সব গো-বদ্যিদের কি তাঁর মত ডিসপেনসারি আছে?

'আপনাকে ডেকেছে বড় মিয়া।' হুকুমালির হালিয়া-চাকর এসে খবর দিল: 'এখুনি যেতে হবে।'

গ্রেপ্তারী পরোয়ানার চেয়েও তেজী। শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সাধ্য নেই এ পরোয়ানা সে গরকবুল করে। তিন-তিনটে গাঁ বড় মিয়ার কবজার মধ্যে। শুকলালের যা কিছু ব্যবসা-পসার তা শুধু সে এই বড় মিয়ার তাঁবে আছে বলে। বড় মিয়ার কথার অবাধ্য হওয়া যায় না।

অথচ বাধ্য হতে গেলে দুর্দশার একশেষ। প্রথমত তিনটে মাঠের কাদা ভাঙতে হবে পর-পর। তারপর যদ্দিন না আক্কেলালি ভাল হয় আটক থাকতে হবে সে-বাড়ি। নিজের হাতে রেঁধে খেতে হবে। বিনিময়ে এক পয়সাও মজুরি পাবে না। ফি চাইবারো তার এক্তিয়ার নেই। বড় মিয়ার খুসিতেই সে বেঁচে আছে। তার খুসিতেই সে রুগী পায়, তার বাড়ি-ঘরে আগুন লাগে না।

কোটের উপর চাদর ঝুলিয়ে রবারের জুতো হাতে নিয়ে চলল শুকলাল। আরেক হাতে ওষুধের বাক্স। পিছনে হালিয়ার মাথায় শুকলালের বিছানা। তার কাঁধের ব্র্যাকেটে ছাতা ঝুলছে শুকলালের।

'কেমন দেখলে?' হুকুমালি ফরসিতে টান মারতে-মারতে জিগগেস করলে।

ঢোক গিলে মাথা চুলকে গলা খাঁকরে শুকলাল বললে, 'একটু জটিল বলে মনে হচ্ছে। তা দুদিনেই সেরে যাবে।'

অনেক ভেবে চিন্তেই বলেছে শুকলাল। সামান্য অসুখ বললে হুকুমালির মর্যাদার প্রতি অবমাননা দেখানো হয়, আর দুদিনে না সারলেও নিজের মান থাকে না।

'ঠিক দুদিন। মনে থাকে যেন।'

শুকলাল চোখে সর্ষে ফুল দেখল। ভাবল, আগুন লাগে বুঝি তার ডিস্‌পেনসারিতে।

দু'দিনে গা ঠাণ্ডা হল না। বিছানার উপর আক্কেলালি এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল।

'কি, কিসের ডাক্তারি শিখেছ তুমি?' হুকুমালি গাল দিয়ে উঠল, 'এক কুইনিন ছাড়া বাপের জন্মে আর কোনো ওষুধ জান না?'

নিস্নু হয়ে বললে শুকলাল, 'সাতদিন না গেলে জ্বরের চরিত্র ঠিক বোঝা যায় না।'

'রাখ তোমার ও সব হামবড়াই। আর দু'দিনে যদি না সারাতে পার, শহর থেকে বোস ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে।'

হুকুমালি সালিশী করতে গিয়েছিল পাশ-গ্রামে, দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখল আক্কেলালির অবস্থা বড় সঙ্গিন। চোখ-মুখ বসে গিয়েছে, হুঁস-বোধ নেই, শরীরের গিঁট-গাঁট সব ঢিলে হয়ে পড়েছে।

'যাও, বোস ডাক্তারকে নিয়ে এস। নাও খোল শিগগির।' ফরমান জারি করল হুকুমালি।

'আমি যাই, নিয়ে আসি গে।' কাঁচুমাচু মুখে বললে শুকলাল।

'না। তুমি যাবে কি করে? তুমি গেলে রুগীর তাকুত করবে কে?'

একেবারে শহরে যেতে না পারলেও নদীর ঘাটে বোস-ডাক্তারের সঙ্গে আগবাড়িয়ে দেখা করলে শুকলাল। বললে, 'ভুলটুল যদি হয়ে থাকে চিকিচ্ছায়, সবাইর সামনে কিন্তু ফাঁস করে দেবেন না। আর, ভুলটুল একটু না করলেই বা আপনাদের ডাকবে কেন? এক ডাক্তার ভুল করে বলেই তো আরেক ডাক্তারের ডাক পড়ে।'

বোস-ডাক্তার দেখলে তন্ন তন্ন করে।

বললে, 'চিকিৎসে ঠিকই হচ্ছে, তবে আরো তেজী ওষুধ দেয়া উচিত। দেয়া উচিত ইনজেকশন।'

'এতক্ষণ দাওনি কেন?' হুকুমালি তেড়ে এল শুকলালের উপর।

'গাঁয়ে এ ওষুধ কোথায়? আমার ডিসপেনসারি তো কাহিল।'

'যাও, তবে নিয়ে এস গে সহর থেকে।'

বিলিতি ওষুধ নেই, পাওয়া যাবে দিশি মার্কা। যাই পাওয়া যাক, যত টাকাই হোক, দেখে শুনে নিয়ে আসুক গে শুকলাল।

বোস-ডাক্তারকে ফি দিল পঞ্চাশ টাকা। শুকলাল চোখ

টিপল। বোস-ডাক্তার বললে, 'তুই জোয়ারের রাস্তা, এখানে ফি আমার একশো টাকা।'

'তা গোসা করবার কি হয়েছে? পাইয়ে দিচ্ছি আপনাকে বাকি পঞ্চাশ।'

হুকুমালি তলব করল পড়শীদের। পাশামুল্লা, মানেরদ্দি, সোনামদ্দি, গহুরালি, সরিফ মোল্লা, কলম সরদার, এমনি প্রায় কুড়ি বাইশ জন।

'শহর থেকে বড় ডাক্তার এসেছে, যার যা অসুখ, এই বেলা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যবস্থা করে নে সব। বার কর নজরানা।'

এ তো মহা মুস্কিল। ভাদ্রমাসে এ সময় সবাইরই জ্বর-জারি হচ্ছে, কারু পেট খারাপ, কারু বুকে সর্দি বসা। একহাঁটু জলে মাঠে কাজ করে কে থাকতে পারে আস্ত-সুস্থ? তা, সবাই তো শুকলালের থেকে হলদে কুইনিন কিনে খেয়েছে, শুকলালকে টাকা দিয়েছে এক প্রস্ত। আবার এ গুনগার কেন? তেমন খাওয়া-পরা নেই, বাত-বন্যার দেশ, অসুখ সবাইরই গায়ে একটু-না-একটু লেগে আছে। হুপ করে জ্বর না এলে বা পেটের ব্যথায় টোক্কা-খাওয়া কেন্নো না হলে কে আবার ডাক্তার ডাকে?

না, এ সুযোগ ছাড়া হবে না কিছুতেই। বাড়ির দরজায় কবে আসবে এমন পাশ-করা শহুরে ডাক্তার? হুকুমালির হুকুম। অমান্য করার সাধ্য নেই।

এর চোখ টেনে ওর জিভ বার করিয়ে এর পেট টিপে ওর

বুক ঠুকে বোস-ডাক্তার নানারকম ব্যবস্থা বাৎলে দিলে। কারু দুটাকা কারু চার টাকা করে জরিমানা। বাকি পঞ্চাশ টাকা উশুল হয়ে গেল দেখতে-দেখতে।

এ পঞ্চাশের থেকে পঁচিশ টাকা শুকলাল নিলে। তার কমিশন। সব চেয়ে যে বিদ্বান ব্যবসা, ওকালতি আর ব্যারিষ্টারি, সেখানেও মামলা জুটিয়ে দিলে দালালি পাওয়া যায়। ডাক্তারের বেলায়ই বা তার উলটোটা চলবে কেন? রবি বোসকে না ডেকে মনসা মুখুজ্জেকেও ডাকা যেত।

দুই ডাক্তার নৌকোয় উঠল। বোস যাচ্ছে ফিরে আর শুকলাল যাচ্ছে ওষুধ আনতে।

'কত আনলে ওষুধের জন্যে?'

'তিরিশ টাকা।'

'টাকা সাতেক লাগবে হয়ত।'

'বাকি টাকায় কিছু ওষুধপত্র কিনে নিয়ে যাব ডিসপেনসারির জন্যে। এদের জ্বর একবার সারলেও আবার জ্বর হয়। ঘরে-ঘরে জ্বর হয়। ওটা বন্ধ করার জন্য কিছু টনিক দরকার। খুব ডিম্যাণ্ড হবে ও-সবের।'

শহরের সেরা দাওয়াইখানা গুরুচরণ ফার্মেসি। তার থেকে এক বাক্স ইনজেকশন কিনলে শুকলাল। কিনলে মিকশ্চার-পাউডার। সেলট্যাক্স সহ সাত টাকা সাড়ে তেরো আনা। আর বাকি টাকায় নিজের ডিসপেনসারির জন্যে সালসা-টনিক।

গাঁয়ে এসে যখন পৌঁছুলো তখন আক্কেলালির বে-আক্কেল অবস্থা, শ্বাস উঠেছে। বোস-ডাক্তার দূরের কলে এসে এ অবস্থার সামনে কোনো দিন নিজেকে পড়তে দেয় না। পাছে চোখের উপর রুগী মারা গেলে ফি না দেয়। গেঁয়ো ডাক্তারের হাতে ফোঁড়াফুঁড়ির চরম দায়িত্ব রেখে শুধু ব্যবস্থা দিয়ে সরে পড়ে। বলে, 'আমাদেরকে ডাকেই একেবারে শেষ সময়।'

'ইঞ্জিশন এসেছে,' 'ইঞ্জিশন এসেছে' সবাই কলরব তুলল। সুঁচের এক ফোঁড়েই আক্কেলালি চোখ মেলবে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসবে।

'আর ভয় নেই।' কোট খুলে ফেললে শুকলাল।

প্যাক-করা আঁট বাক্স, এক কোণে খানিকটা সুতো ঝুলছে। এই সুতো ধরে টানলে বাক্সের ডালা সুতোর লাইন ধরে কেটে যাবে। ভিতর থেকে বেরুবে ইনজেকসনের য়্যামপিউল। ভিতরে ছুরির পাত আছে, তা দিয়ে ডগা কেটে সুঁচে ভরে নিতে হবে ওষুধটা। তারপর ফুঁড়তে হবে বিসমিল্লার নাম নিয়ে।

শুকলাল বাক্সের ডালা ছিঁড়ল। কিন্তু কোথায় য়্যামপিউল! চারটে খোপে চারটে কাগজের টিপলি!

'ওষুধ নেই।' শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল: 'খাঁচা থেকে পাখি বার করে নিয়েছে শালারা।'

হুকুমালি পাথর হয়ে রইল। হাতের লাঠিটা কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

এলোধাবাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল শুকলাল। এখন কি করে, কি ক'রে বাঁচায় আক্কেলালিকে? হুকুমালি জুলুম করেছে, বাস-ডাক্তার জুলুম করেছে, সে জুলুম করেছে, কিন্তু এ জুলুম-বাজির তুলনা কোথায়! মুমূর্ষুর প্রাণ নিয়ে জোচ্চুরি! প্রাণ শুধু আক্কেলালিরই যাবে না, শুকলালেরও যাবে। বাক্সের পেটের মধ্যে সে ঢুকতে পারত না এ বুঝলেও হুকুমালি তাকে ক্ষমা করবে না। ব্যবসাপত্র তুলে এবার চলে যেতে হবে চর অঞ্চলে। ডাক্তারির তকমা খুইয়ে হতে হবে হাতুড়ে-নাপিত।

ডিসপেনসারিতে চুপচাপ বসে ছিল শুকলাল। অনেক দিনের মেঘলার পর আজ রোদ উঠেছে। কিন্তু শুকলালের মনে এক ফোঁটা সুখ নেই। কবে যে হুকুমালির আক্রোশ দাঙ্গা ও আগুনের আকারে দেখা দেবে তার চারপাশে, তারই ভাবনায় সে মুষড়ে আছে। যে প্রকাণ্ড জুয়াচুরিটা শুকলালের হাতের উপর হয়ে গেল, তাতে শুকলালের কোনই অংশ নেই, এ কথা হুকুমালিকে কেউ বিশ্বাস করতে দেবে না।

লাঠির শব্দ হতেই শুকলাল ত্রস্ত হয়ে চোখ চেয়ে দেখল, সামনেই হুকুমালি। কতক্ষণ দু'জন একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'মন খারাপ কোরো না, শুকলাল। তোমার জন্যে এই এক তোড়া টাকা এনেছি।' বলে এক থলে টাকা হুকুমালি শব্দ করে শুকলালের টেবিলের উপর রাখলে। বললে, 'তিন গাঁয়ের

মধ্যে এই একটা মাত্র ডাক্তারখানা। এই টাকা দিয়ে ভাল দোকান থেকে ভাল দেখে ওষুধ কেন তুমি, তোমার ডিসপেনসারি সাজিয়ে ফেল। আমার আক্কেলালি গেছে, কিন্তু পাশামুল্লা, মানেরদ্দি, সোনামদ্দি, গহুরালির ছেলেরা যেন না মরে।'



"শুভ বিবাহের কাবিননামা দেন মোহরানা মং ১০০০৲ মাসিক খোরাকি মং ২০৲ টাকা। গ্রহিতা মোসাম্মত বাহারানন্নেছা বেগম…দাতা শ্রীমুন্সী হিম্মত আলি…জাতি মুসলমান, পেশা হালটি…কস্য শুভবিবাহের কাবিননামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আপনি মুসলমানী ভদ্র স্ত্রীলোক, আপনাকে আমি মুসলমানী সরাসরিত মতে শ্রীযুত বিল্লাতালি সিকদারের ও শ্রীযুত আসমত আলি কারিকরের রায়বারিতে এবং শ্রীযুত নয়ান খাঁ, দেনে আলি, হাতেম সরদার এই সমস্ত ভদ্রলোকগণের সাক্ষাতে আপনাকে আমার নিজ জজিলতে আনয়ন করতঃ নিম্ন-লিখিত সর্ত্ত সমূহে বাধ্য থাকিয়া সজ্ঞান ও সরল মনে অত্র কাবিননামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন…তারিখ…ইং…।

সর্ত্ত ১। আপনাকে উক্ত বিবাহের দেন মোহরানা মং ১০০০৲ এক হাজার টাকা ধার্য করতঃ উক্ত টাকার মধ্যে মং ৩০০৲ তিন শত টাকা আপনার পিতা খোদাবক্স মুছল্লি সাহেব নিকট বুঝাইয়া দিলাম এবং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা আপনাকে জেওর ও পোশাক

পরিচ্ছদ বাবদ বুঝাইয়া দিলাম এবং বাকি ২০০৲ দুই শত টাকা আমাদের বিবাহ স্থির থাকা কালতক আপনার তলব মতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিব। ২। সর্বদা আপনাকে মুসলমানী শাস্ত্র অনুযায়ী রোজা নামাজ শিক্ষা দিব, কখনও আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ করিব না। ৩। আপনাকে আমার নিজ পরিবারবর্গের সহিত একত্রিত ভাবে রাখিব এবং আমার পরিবার-বর্গের সহিত কখনও মিল-মহব্বত না হইলে আমার নিজ ব্যয়ে ভিন্ন হাবিলী প্রস্তুত করতঃ তথায় আপনার সহিত বসবাস করিব। ৪। কখনও আপনার পিত্রালয়ে বা আপনার কুটুম্বালয়ে যাইতে হইলে আমার নিজ ব্যয়ে তথায় যাইব ও আমার নিজ ব্যয়ে নিয়া আসিব। ৫। আমার অন্য কোন দূরদেশে কোন কার্যবশতঃ যাইতে হইলে আপনার অনুমতি নিয়া যাইব এবং আপনাকে মং ২০৲ কুড়ি টাকা করিয়া মাসিক খোরাকি দিয়া যাইব। ৬। উক্ত চুক্তি হায়ের বিপর্যয় কোন কার্য করিলে আমি তজ্জন্য আদালতে দায়ী থাকিব। ৭। খোদা না করুন আমি যদি কোন কারণে কারাদণ্ড দ্বীপান্তর বা কারারুদ্ধ বিকলাঙ্গ বা নিরুদ্দেশ হই তবে আপনি আমার জন্য অন্ততঃ ২ বৎসর অপেক্ষা করিয়া ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন তদ্বিরুদ্ধে আমি কোন ওজরাপত্তি করিলে তাহা আদালতের অগ্রাহ্য হইবেক। ৮। আমি দ্বিতীয় কোন নিকা বিবাহ করতে পারিবনা, করিলে তৎক্ষণাৎ আপনি আমাকে সরা অনুযায়ী ১।২।৩ তালাক বাইন দিতে পারিবেন,

তাহা না হইলে দ্বিতীয় স্ত্রী আপনার চির অধীনা হইয়া থাকিবে। অত্র দলিলের মর্ম দাতাকে পাঠ করিয়া শুনাইলাম শ্রীচতুর্ভুজ দে লিখক সহ সাক্ষী তিন জন। রেপ কাগজ ৩ ফর্দ...”

চতুর্ভুজের থেকে খবর পেলে খোদাবক্স, বাহারনের বাপ। খবর শুনে খাপরার আগুনের মত খাপ্পা হয়ে উঠল। ঝুট, বিলকুল ঝুট, বেবাক মিছে কথা। চাল সেদ্ধ করা দূরের কথা জল গরম করার যার সংস্থান নেই, সেই হিম্মত আলি পাঁচশো টাকার জেওর দিল বাহারনকে আর তাকে দিল তিন শো টাকার সেলামি এ নিরেট গাঁজাখোর ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া, তারা মিঞা, তাদের জননারা থাকে পর্দার হেপাজতে। বাহারনের সঙ্গে কি করেই বা তার দেখা হয়, কি করেই বা তাকে সাদি করে। বাহারন বালেগ হল কবে?

দলিলের নকল বার করল রেজেষ্ট্রি আপিস থেকে। একেবারে পাকা-পোক্ত দলিল, সই-সাবুদ, ইসাদী-নিশানদারে মাফিকসই। খোদাবক্স অনেক হেবা-ইজারা পাট্টা-কবুলতি রেহান-তমশুক দেখেছে, কিন্তু দেখেনি এমন একতরফা বিয়ের দস্তাবিজ। উদ্ভট, আজগুবি। বেবুনিয়াদ।

কিন্তু, আসলে ব্যাপার কি? ডাকল বাহারনকে।

‘হিম্মত আলিকে চিনিস?’ খোদাবক্স চোখ পাকাল।

'কে না চেনে? গনি মুন্সির ছেলে, নিকারীদের বাড়ির নগিজে বাসা। কত গোল্লাছুট খেলেছি এককালে। এখন সে লায়েক হয়েছে, ক্ষেতে-গোলায় কাজ করে। আর আমিও বড় হয়েছি, পর্দার অন্দরে বসে থাকি। দেখ-শোন আর হয় না।' বাহারনের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল।

'ও তাকে সাদি করেছে?' খোদাবক্স ধমক দিয়ে উঠল।

'ওমা, সে আবার কি কথা! ওরা বেপারী আমরা হাওলাদার। অসাজন্তু ঘর। ওখানে বিয়ে হবে কি? বিয়ে হবে তো, বিয়ের মজলিস হবে না? বাপ-চাচারা জানতে পারবে না? দেইজি-দায়াদরা খাবেনা একদিন গোস্ত-পোলাও?'

'ও তো দেখি এক কাবিননামা রেজেষ্ট্রি করে রেখেছে।'

'বা, ওর মনজাইমত দলিল একটা করে রাখলেই হল? আমরা তা কবুল করলাম কোথায়? ও ভাক্ত দলিল, স্রেফ ফেরেববাজি। কেতাব-কলমা পড়লাম না, কাজীর দরবারে গেলাম না, আর অমনি কাবিননামা হয়ে গেল!' বাহারন চোখ ঘুরিয়ে ভুরু কুঁচকে বললে।

খোদাবক্স কাবিন-রদের মামলা বসাল। বাহারনকে করলে নাবালিকা, সে হল আসন্ন বক্সু। বললে, আমার শাসন-সংরক্ষণে আছে, আছে পর্দার ঘেরাটোপে। তদন্তে প্রকাশ, হিম্মত আলি শঠতা ও ফেরবমতে কাবিননামা সম্পাদন করেছে একটা।

নাবালিকা বাহারানন্নেছার বরাবর। সে দলিল পণ্ড, অকর্মণ্য। বেদাঁড়া, তঞ্চকী, যোগসাজসিক। অলি-অছি নেই, নাবালিকার বিয়ে সিদ্ধ হয় কি করে? তা ছাড়া, কারু ওকালতিতে বিয়ে হয়নি। হয়নি কোনো দেন-মোহরের লেন-দেন। পোশাক-আসাক জেওর-অলঙ্কার বাবদ দেয়নি কোনো টাকাকড়ি, ক্রান্তি-দন্তি। সব মিথ্যা, জালসাজি। এ দলিল কিছুতেই বহাল ও বলবৎ থাকতে পারেনা। এ দলিল রহিত চাই। বিবাদীর প্রতিকূলে ডিক্রি চাই খরচের।

পুঁথি পাঁচালি পড়তে পারে বাহারন। আর্জির কানিতে ও সত্যপাঠের নিচে সে দস্তখৎ দিলে।

জিলকি-ঠাটার দেশ, দেখতে-দেখতে মেঘ ডেকে বৃষ্টি নামল। নদীর ঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল বাহারন, দাঁড়াল গিয়ে বাদাম-কদম গাছের নিচে। ঘোর-ঘোর আবছা-আবছা চার দিক। থেকে-থেকে জিলকি দিচ্ছে, আবার অমনি অন্ধকার। ঠাটার শব্দে বুকে চোট লাগছে চমকের।

না, ভয় নেই। সামনেই হিম্মত আলি।

বাহারনের মনে হল, এখুনি শূন্য কলস মাটিতে ফেলে দিয়ে হিম্মত আলির হাত ধরে বুঝি নৌকোতে গিয়ে উঠবে। তারপর ঢেউছেঁড়া ঝোড়ো নদীতে পাড়ি জমাবে দূরান্তরের দেশে।

হিম্মত আলির গলার স্বর ভিজা, মনমরা।

বললে, 'তোমার বাপ কাবিনরদের মামলা বসিয়েছে।'

'শুনেছি।'

'আমিও ছাড়ব না, জবাব দেব। বউ ফিরে পাবার উলটে নালিশ করব আমি।'

'বউ?' বাহারন ঝিলকি দিল চোখের হাসিতে।

'হ্যাঁ, বলব, তোমার পনেরো বছর পেরিয়ে গেছে, তুমি বালেগ হয়েছ। কাবিননামা কবুল করে নিয়েছ তুমি। পেয়েছ তুমি দেন-মোহরের গয়না-পোশাক। তুমি—তুমি আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে। নিঘঘাত তবে জিত হবে আমার। তোমাকে পাঁজকোলে করে বাড়ি নিয়ে যাব।'

'এখুনি নিয়ে চলো না।'

'এখুনি?' কেমন যেন ধাঁধা দেখছে হিম্মত।

'হ্যাঁ, তাই তো কথা ছিল। মামলা-মোকদ্দমার ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে ঢুকবে এমন ভেবেছিলে নাকি?'

না, কথা ছিল অন্যরকম। কথা ছিল, কাবিননামা রেজেষ্ট্রি করে এসেই হিম্মত আলি বাহারনকে নিয়ে যাবে দূরদেশে। ঢাকায় কিম্বা চাঁদপুরে। যদি কেউ বলে ফুসলিয়ে ঘরের বার করে এনেছে, খুলে দেখাবে কাবিননামা। বাপ-চাচারা যদি নিতে আসে ফিরিয়ে, তবে বাহারন বলবে, সাবালক হয়েছি, সেয়ানা হয়েছি, স্বামীর সঙ্গে ওঠা-বসা করেছি, এখন ফিরব কি করে? এখন ফিরে গেলে যে অধর্ম হবে। বেআইনি হবে।

সেই রকমই কথা ছিল। কাবিননামা দেখিয়ে ফাঁকায়-ফাঁকায় বিয়ে হাসিল করে নেবে এই ছিল বন্দোবস্ত। কিন্তু তার আগেই রুজু হয়ে গেছে মোকদ্দমা। কাবিনরদের মোকদ্দমা।

'তাতে কি?' বাহারন ঝাপটা মেরে ওঠে: 'মামলার নামে পড়ে থাক মামলা, দুজন আমরা চলে যাই এখুনি। একেবারে কাজীর দরবারে। সোজাসুজি কেতাব-কলমা পড়ি। সই-সাবুদ করে নতুন কাবিননামা রেজেষ্ট্রি করে দি। যেটা রদ করতে চায় সেটা ছিঁড়ে ফেলে দি টুকরো-টুকরো করে।'

হিম্মত আলি চুপ করে কি ভাবল কতক্ষণ। বললে, 'ওতে বড় হুড়হাঙ্গামা বেধে যাবে।'

'তা তো বাধবেই একটু।' দু চোখে রঙ্গিল হাসি ফোটাল বাহারন: 'একটা ভর-বয়সের মেয়েকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাবে, একটু হৈ-হুজ্জুত বাধলে আর আশ্চর্য কি! বাধুক না। এতটুকু হিম্মত না থাকলে তোমার নাম হিম্মত আলি হয়েছে কেন?'

আরো কতক্ষণ কি ভাবল হিম্মত। বললে, 'না, মামলা করছে মামলাই চলুক। আদালতে চূড়ান্ত সাব্যস্ত হয়ে যাক। তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি। করি ঘর-সংসার।'

'কিন্তু আল্লার বিচারের মত হাকিমের বিচার যদি না ঠিক হয়? যদি তুমি হারো?'

'কেন হারব? তুমি আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে। বলবে, হ্যাঁ, কাবিন হয়েছে ঠিকঠাক, আমি তা কবুল করে নিয়েছি, পেয়েছি গয়না-পোশাক, পেয়েছি মোহরানা। ব্যস, আর পায় কে, এক কথাতেই মেরে দেব কেল্লা।'

আদালতের লড়াইয়েই বোধ হয় বেশি সুবিধে। ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট কম। কেবল কথার যুদ্ধ, উকিলের গলাবাজি। নিজে শুধু চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক আর মাঝে-মাঝে ট্যাঁক ওলটাও। অন্য রকম লড়াইয়ে যে লাঠি লাগে, ল্যাজা লাগে, জোর-জেদ লাগে। তার চেয়ে ফাঁকিজুঁকি দিয়ে বউ হাত করতে পারা অনেক সোজা।

কমিশনে জবানবন্দি দিল বাহারন, চিকের ভিতর থেকে। বললে, কিসের বিয়ে, মিথ্যে কথা, হিম্মত আলিকে দেখেইনি সে কোনদিন। সে নাবালক, বাপের হেপাজতে আছে। কাবিন-নামা কপট দলিল, জালিয়াতের কারসাজি। সে নেয়নি কখনো তা কবুল করে। পায়নি কানাকড়ির মোহরানা, একটা বা রুপোর নোলক। যেমন খালি ছিল তেমনি সে খালি আছে।

হ্যাঁ, কাবিননামা রহিত চাই।

শেষ শুনানির দিন হাজির হলনা আর হিম্মত আলি। ঝোরে গেল মাছ ধরতে।

এমদাদ বয়াতির সঙ্গে বাহারনের বিয়ে হয়ে গেল।

এমদাদের বয়েস অনেক। তা হোক, কিন্তু তার অবস্থা বিস্তর। জমি-জায়গা আছে পনেরো কানির উপর। রায়ত-

বর্গাইত আছে। ধান-পান আসে, আসে নগদ টাকার খাজনা।

কিন্তু, বলতে কি, বাহারনের মনে সুখ নেই। হিম্মত আলির জোর-জেদ নেই বলে একদিন যে সে নালিশ করেছিল, মিথ্যে করেছিল। কিন্তু এর যে হুঁস-বোধ নেই, ভাপ-তাপ নেই। তামাসা-ফষ্টি পর্যন্ত বোঝেনা। বোঝে না কোন বয়সের কি।

বাপ-চাচার হুকুমদারিতে অমন শেখা-সাক্ষী না দিলেই সে পারত। উকিল-সাহেব যখন জিগগেস করলে, কি, চেন হিম্মত আলিকে, তখন তার জিভের ডগা থেকে ছিটকে বেরোতে চেয়েছিল, হ্যাঁ চিনি, সে আমার খসম, আমার স্বামী। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছে, সামলাতে গিয়ে ধড়াস-ধড়াস করেছে বুকের মধ্যিখানটা। গলাখাঁখরি দিয়ে বাপ তাকে সাহস দিল, চাচা বললে, ভয় কি, বল না সাঁচা কথা।

কোন কথাটা সত্য, তা আল্লা জানে। আল্লার নিচে হাকিম, সে জানবে কি? মোকদ্দমা ডিক্রি-ডিসমিস করতে পারে, জমি নিলেম করিয়ে দখল দিতে পারে, কিন্তু ভাঙা মন জোড়া দিয়ে দিতে পারে না, সুখের দিনের দখল দিতে পারে না ফিরিয়ে।

খায় দায় ঘুমোয়, গয়নাগাটি শাড়ি-কাঁচুলি পরে, কিন্তু মনটা হু-হু করে। ভাটির দেশের পুবালি বাতাসের মত। নিশি-পাওয়ার মত ঘুরে বেড়ায় নদীর ঘাটে, লাঙল-টানা বলদের

পিছে-পিছে, ঝোরে-বিলে মাছধরার ডিঙি নৌকায়। হাটের পথে কত লোক আসে যায়, কিন্তু হিম্মত আলিকে দেখতে পায় না।

এমদাদ বন্নাতি মারা গেল।

আর, ইদ্দত কাবার করেই নিকা বসল বাহারন। নিকা বসল হিম্মত আলির কাছে।

হিম্মত আলি এ পর্যন্ত বিয়ে-সাদি করেনি। শুধু বসে ছিল অপেক্ষা করে। যেন জানত, বাহারনকে সে ফিরে পাবে। নদী-ভাঙা জমি যেমন চর হয়ে দেখা দেয় তেমনি নতুন হয়ে দেখা দেবে বাহারন।

খাঁচার থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি। এসেছে ঝড়ের মধ্য দিয়ে উড়াল দিয়ে। ছেঁড়া-ছেঁড়া পালক, হা-ক্লান্ত চেহারা। ভয়-পাওয়া স্থির চোখের চাউনি। সেই হাসির ঝিলকি নেই, জেল্লা-জমক নেই। কেমন ধ্বসে গেছে, থেঁৎলে গেছে। এখন তার অনেক আদর-আরাম দরকার। অনেক তাউত-তদারক। হিম্মত আলি ছাড়া কে আর তার তরফদারি করবে? তার আর কে আছে।

বাহারনের চুলভরা মাথা বুকের উপর তুলে এনে হিম্মত ডাকে : 'বাহার।'

বাহারন মুখ তোলে না-বলে : 'আল্লা—'

খারাপ-মন্দ অবস্থা হিম্মতের, নিজ হালে জমি নেই, চাষ করে বর্গায়, বছরভোর খোরাকির ধান জোটে না, তবু সেই সচ্ছলতার চেয়ে এই অভাব-অভিযোগ অনেক ভাল। বিছানা-তোষকের চেয়ে ঢের ভাল এই হোগলা-মাদুর। বিবিয়ানির চেয়ে গেঁয়ো গেরস্তালি। মুখের ভালবাসার চেয়ে মনের ভালবাসা।

আল্লা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন এই অভাবের দিনও নিশ্চয়ই চলে যাবে।

এমদাদের ত্যক্ত সম্পত্তিতে ফারাজ অনুসারে মোটা অংশ পেয়েছে বাহারন। প্রায় চার আনা সাড়ে সতেরো গণ্ডা। সরিকেরা দিচ্ছে না তাকে তার অংশের ধানপান, খাজনাপাতি। মেয়েছেলে, মাঠে নামতে পারে না। নিকার পর আগের সোয়ামীর বাড়ি যেতে অসম্মান লাগে। হিম্মত আলি গিয়ে দাবীদার হলে তাকে সবাই হটিয়ে দেয়, বলে, তুমি কে বিরানা লোক!

'তোমার অংশ আমাকে তুমি কবালা করে দাও, সাফ কবালা।' হিম্মত আলি বলে জোর গলায় : 'দেখি আমাকে আর ওরা কি করে হটায়! দেখি স্বত্ব বর্তাতে পারি কিনা। দেখি আইন-আদালত আসে কিনা আমার কবজার মধ্যে।'

আগে ছিল মনের মানুষ, এখন হয়েছে ঘরের পুরুষ, তাকে

অদেয় আছে কী বাহারনের! পুরুষ ছাড়া জমি-জিরাতের উপস্বত্ব সে কি করে ভোগ করবে? পুরুষ ছাড়া সে জোর খাটাবে কি করে? জুলুমবাজ সরিকদের জব্দ করবে কি করে? যাকে ধর্ম দিয়েছে তাকে আর জমি দিতে পারবে না?

তাই আবার আরেকটা দলিল হল :

"জিলা…ষ্টেশন সবরেজিষ্টার…অধীন পরগনে…কবালা মবলগ পাঁচশত টাকা। গ্রহীতা শ্রীমুন্সি হিম্মত আলি…দাতা মোসাম্মত বাহারনন্নেছা বেগম পতি মৃত এমদাদ আলি বয়াতি হালপতি শ্রীমুন্সি হিম্মত আলী…জাতি মুসলমান, পেশা হালটি…কস্য স্থাবর সম্পত্তির সাফ বিক্রয় কবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমি নানারূপ ঠেকা থাকা বশতঃ আমার নগদ-টাকার আবশ্যক হওয়ায় আমার ভোগ দখলীয় নিম্ন তপশিলের লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করার প্রস্তাব করিলে তাহা আপনি সর্ব উচ্চ বাজারদর উচিত বহায় মূল্য দ্বারা খরিদ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় আমি আমার আপন ইচ্ছায় সজ্ঞানে সরল মনে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনানুরোধে আপনার নিকট মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মূল্যগ্রহণে দরেবস্ত হক-হকুক নিঃস্বত্বে সাফ বিক্রয় করিলাম। বিক্রীত সম্পত্তিতে আমার যে কিছু স্বত্ব লভ্য দখল অধিকার দাবী দাওয়া স্বত্ব স্বামিত্ব ছিল তাহা সমুদয় অত্র দলিল মূলে রদ ও রহিত হইয়া আপনার প্রতি পর্যাপ্ত হইল। বিক্রীত সম্পত্তিতে আপনি অদ্য হইতে আমল দখলকার নিযুক্ত

হইয়া মালিকান সরকারে আমার নামের পরিবর্তে আপনার নিজ নাম খারিজ লিখাইয়া লইয়া সদর খাজনা আদায় পূর্বক ভূমি মজকুর আমল দখল করতঃ কাটিয়া ভরিয়া যথেচ্ছাক্রমে দান বিক্রী স্বত্বাধিকারীর মালিক হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারীশানক্রমে সর্বপ্রকার ক্ষমতা পরিচালনে পরমসুখে ভোগ-দখল করিতে থাকিবেন। তাহাতে আমি বা আমার স্থলবর্তী ভাবী ওয়ারীশান কস্মিন কালেও উক্ত বিক্রীত সম্পত্তিতে কোনও প্রকার দাবী-দাওয়া করিতে পারিব না ও কেহ পারিবেক না, যদি করি বা কেহ করে তবে তাহা সর্বতোভাবে বিচার আদালতের অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে বিক্রীত সম্পত্তির কোনও অংশ ইতিপূর্বে অন্য কেহর নিকট কোনরূপ দায়সংযোগ কি হস্তান্তর করি নাই, করা প্রকাশ পাইয়া আপনার খরিদা স্বত্বের কোনও ক্ষতি হইলে বঞ্চনার অপরাধে ফৌজদারীর বিধান মতে দণ্ডনীয় হইব এবং অত্র কবালা দলিলের স্বত্বই প্রবল ও বলবৎ থাকিবে। আরও প্রকাশ থাকে যে নীচস্থ প্রজার নিকট রসিদে-বেরসিদে খাজনা আদায় করিতে পারিবেন এই সকল অঙ্গীকারে দলিলের মর্ম জ্ঞাত হইয়া বহায় টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া আমার সজ্ঞানে সরল অন্তঃকরণে স্বেচ্ছাপূর্বক নিজ লোকের পরামর্শ গ্রহণে অত্র সাফবিক্রয় কবালা লিখিয়া দিলাম ইতি…সাল…ইং। অত্র দলিল পাঠ করিয়া, দাতাকে শুনাইলাম লিখক ও পাঠক শ্রীনকুল চন্দ্র মাইতি …ইসাদী…

আমার নিকট মং ৭॥ আনার ষ্টাম্প না থাকায় ক্রমিক নং দ্বারা পূরণ করিলাম শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র দাস ভেণ্ডার…"

দলিল রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল। আসল দলিল বার করে আনলে হিম্মত আলি। বললে, 'এবার আমাকে পায় কে।' বলতে-বলতে দলিল বন্ধ করলে টিনের বাক্সে।

বাহারনের খুসির আজ আর অন্ত নেই। তার মনের মানুষ, ঘরের পুরুষকে সে খুসি করতে পেরেছে।

হিম্মত আলি বললে, 'একটা দাওয়াত দিই। বিয়ের পর পড়শীদের খাওয়াইনি এক দিনও। কি বল?'

বাহারন বললে, 'নিশ্চয়ই। পোলাও-কোর্মা রান্না করে দিই।'

বাছা-বাছা দু'চার জনকে মোটে নিমন্ত্রণ করেছে হিম্মত আলি। যাদের সবাই মানে-গোনে এমন সব মোড়ল-মাতব্বর দেখে। উকিলদ্দি, মোক্তার আলি আর ঠাকুর গাজী। পোলাও-কোর্মায় দরকার নেই, কিছু মিঠাই-মণ্ডা দিলেই চলে যাবে।

আগের দিনের শাড়ি পরে ও কাঁচুলি এঁটে বাহার দিয়েছে বাহারন। খোলতাই খুলে গেছে তার চেহারার।

কিন্তু হিম্মত আলি দেখছে আজ তাকে এক নতুন রকমের দৃষ্টিতে। সে নেমে গেছে, ভেঙে গেছে, ধ্বসে গেছে। দাগ-দেওয়া, পোকায়-খাওয়া, ঘুনে-ধরা তার শরীর। সেখানে যেন

অনেক দাগাবাজির চিহ্ন। কেবল হাত-বদলের দস্তখৎ। তার মন যেন এঁটোকাঁটার আঁস্তাকুড়ে ভনভনে মাছি।

বাহারনকে ডাকলে হিম্মত আলি। ঘরের ভিতর থেকে বাহারন দাঁড়াল এসে হাতনেয়।

মোড়ল মাতব্বররা বসেছে উঠানে, বাঁশের নীচু মাচার উপর।

'শুনুন, আপনারা সব সাক্ষী,' হিম্মত আলি হাঁক দিল: 'আমি আমার নিকাই বিবি খোদাবক্স মুছল্লির কন্যা বাহারন-নেছাকে তিন তালাক দিচ্ছি। এক তালাক—দুই তালাক—তিন তালাক। তালাক বাইন।'

বাহারন একটা চীৎকার পর্যন্ত করল না। টলতে-টলতে ঘরের মধ্যে এসে বসে পড়ল মাটির উপর। স্পষ্ট চোখে পড়ল নতুন-কেনা হিম্মত আলির তালা-বন্ধ টিনের বাক্সটার দিকে। চোখ ফেরাতে পারল না।

কিন্তু, না, সে আর এই ঘরের মধ্যে কেন? কার ঘরের মধ্যে? তার আর সরম-সম্ভ্রম কি, মান-বেমান কি! তার জন্যে আর ঘরের আবরু নয়, পথের বেপরদা। কেউ ডাকবে, কেউ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। শেষে রোজ জুম্মাবারে ঘটি হাতে করে খয়রাত চাইবে দুয়ারে-দুয়ারে।

সাজগোজ ফেলে দিয়ে সাধারণ ছেঁড়া শাড়িখানা পরে আধ বুকে আঁচল টেনে হিম্মত আলির বাড়ি থেকে চোরের মত, বিতাড়িত ভিক্ষুকের মত, বেরিয়ে গেল বাহারন।

বেদখলী

চার দাঁড়ি পান্‌সি হাঁকিয়ে ঐ কে যায়? নৌকোর ভিতরে হ্যা সা গ জ্ব লছে, বা জছে গ্রা মো ফো ন, চ লে ছে গুলতানি। বরযাত্রী চলেছে নাকি কারা? না, ছোট হিস্যার জমিদারবাবু বেরিয়েছেন ফুর্তি করতে?

ঘুমন্ত গ্রাম হকচকিয়ে ওঠে।

'কে যায় ও?' ঘাটের থেকে কে হেঁকে জিগগেস করে।

'আদালতের লোক। চলেছি দখল দিতে।'

'কোন গ্রাম?'

'গাজিপুর।'

'তা এত আমোদ কিসের?'

'সঙ্গে খোদ নাজির সাহেব আছেন যে।'

গাজিপুরে কাছারি বাড়ির সামনে নৌকো থামল পরদিন সন্ধেসন্ধি। নায়েবমশায় ও তার মুহুরি এসে হাজির, সঙ্গে কাছারির দুই পেয়াদা। মাথায় দুই ঝাঁকা। একটাতে চাল, ডাল, তেল, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলু; আরেকটাতে ফজলি আম গোটা কুড়ি, এক হাঁড়ি দুধ, সের পাঁচেক চিনি, সের দুই ঘি

আর একটা পেয়াদার হাতে চার চারটে মুরগি, দড়ি দিয়ে পা বাঁধা।

মাঝি বলে উঠল, 'তামাক ?'

সামনের দোকান থেকে মাখা তামাক নিয়ে এল আধ সের।

নাজিরের সঙ্গে বাছা বাছা চারজন পিওন। তার উপরে তার পরনে হাফ প্যান্ট, মাথায় টুপি। তার উপরে বন্দুক। প্রজা অত্যন্ত দুর্দান্ত।

পিওনদের মধ্যে ঝানু হচ্ছে অশ্বিনী। সে নায়েবের দিকে একটু হেসে বসে জিগগেস করে, 'কাজ কি করবেন, না মীমাংসা করবেন ?'

'মীমাংসা ?' নায়েব গর্জে উঠল, 'ওকে শায়েস্তা করতে না পারলে মালেকের জমিদারি এখান থেকে ইস্তফা দিয়ে যেতে হবে। ও কি কম জ্বালান জ্বালাচ্ছে! নিজে তো কোনো টাকা-পয়সা দেবেই না, উল্টে অন্যদের সলা-পরামর্শ দিচ্ছে ওরাও যাতে না দেয়। চব্বিশ হাজার টাকার মহাল একেবারে মাটি হবার জোগাড়!'

'বেশ, জমিদারি কায়েম রাখব, কিন্তু আমাদের, বুঝলেন কিনা—বিষয়টি তো আর সোজা নয়—আমাদের অন্তত—' অশ্বিনী তিন আঙুল দেখাল।

'আগে কাজ তো হোক—' নাজির উদাসীনের মতো বললে।

'আপনি কথা কইবেন না নাজির সাহেব।' অশ্বিনী ঝামটা

দিয়ে উঠল, 'অন্তত তিনশ টাকা না পেলে এ কাজে যাচ্ছি না আমরা। ওরা তবে পুলিশযোগে দখল নিক।'

'না, না, দেব'খন খুশি করে। ঘর-ভাঙা দখল তো পাই আগে।' নায়েব অরাজি নয়।

'আপনার লোক-লস্কর, নিশানদার-মোকাবিলা, মায় ঘরামি-মিস্তিরি—সব জোগাড় রাখবেন সকাল বেলা। আর সমস্ত যন্ত্রপাতি।' নাজির গম্ভীর মুখে বললে, 'যত দুর্দান্ত হোক, দখল আমি দেবই।'

'আদাব মহারাজ', নায়েবকে এক সেলাম ঠুকল জবিরউদ্দিন, দ্বিতীয় পিওন। বললে, 'আমরা কিন্তু আপনার তাঁবেদার। ভুলবেন না তিন আঙুল। পুলিশ হলে ক' আঙুল লাগে তার ঠিক কি!'

ভোরবেলা। নাজির, পিওন সবাই হাজির হল কাছারিতে।

চাপরাশির চাপ দেখেই গাঁয়ের লোক সন্ত্রস্ত, এখন নাজিরের হ্যাট আর বন্দুক দেখে সবাই কুঁকড়িসুঁকড়ি হয়ে গেল। আদাব পড়তে লাগল চারদিক থেকে।

'এই আমাদের পাইক, নাম কালা গাজী। এ-ই নিশানদিহি করবে।' নায়েব গলা নামালেন, 'দেখুন, কাজ যদি হয় সহজেই হবে। দায়িকের দুই শালা আর এক মামু আছে—ভীষণ দাঙ্গাবাজ। গাঁয়ের সর্দারি করাই ওদের পেশা। শুনতে পেলাম, ওরা কুটুমসাক্ষাতে গেছে, ফেরেনি এখনো।'

'না বাবু, রাত্রেই ফিরে এসেছে নাকি।' কে একজন বললে, ভিড়ের মধ্য থেকে, 'উত্তরের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সঙ্গে ল্যাজা, শাবল, সড়কি, রামদা পর্যন্ত। আগে থেকে বেরুবে না নাকি, ঘরে ঢুকলেই বসিয়ে দেবে। ওরা একাই একশো লোক ফিরিয়ে দিতে পারে।'

'তবে আর কি! ফিরে আসব।' নাজির হতাশার ভঙ্গি করল। 'তুমি বুঝি কিছু হও ওদের?'

লোকটা লজ্জা পেল। মালিকের হয়ে কথা বলতে এসে বোধ হয় দায়িকের প্রতি অলক্ষ্যে একটু সহানুভূতি দেখিয়ে ফেলেছে। কিছুই হয় না সে দায়িকের। গ্রাম সুবাদে চাচা দাদা বলেও ডাকে না। তবু কেন কে জানে, মুখে মালিকের দিকে হলেও মন পড়ে আছে দায়িকের ঘরের দুয়ারে।

'দায়িকের বাড়ি কদ্দুর?'

'প্রায় ক্রোশখানেক। খাল দিয়ে যেতে হবে।'

'আপনার লোক সব খাঁটি তো? না মেকিও কিছু আছে?'

'আর বলবেন না অদৃষ্টের কথা। বেশির ভাগই মেকি। মুখে খুব আস্ফালন করবে, কিন্তু মনটা আসলে ওমুখো।'

কারু গায়ে গেঞ্জি, কারু ফতুয়া, কারু বা গা খালি, পরনে খাটো কাপড়, কারু লুঙ্গি, কারু বা গলায় একখানা গামছা— সবাই রওনা হলো দায়িকের বাড়ির দিকে। চাপরাশিদের হাতে

লাঠি, নাজিরের কাঁধে বন্দুক। পিছনে আর সব। সঙ্গে কৌতূহলী জনতা।

'কই হে ইমানদ্দি—'নাজির বন্ধুর মত হাঁক দিল।

'খবরদার শালারা, বাড়ির মধ্যে এলে মায়ের কোলে আর ফিরে যেতে পারবে না।' দায়িক ইমানদ্দি ও তার ভাই বশিরদ্দি ল্যাজা হাতে করে ছুটে বেরিয়ে এল, ধাওয়া করল নাজিরের দিকে।

কাঁধের বন্দুক চট করে নামিয়ে বাগিয়ে ধরল নাজির। বাড়ির সীমানার বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'ভাই।

ইমানদ্দির গলায় শামুকের মালা, মাথায় বেঁধেছে লাল ফেটি। পাগল সেজেছে। একটা খুনখারাপি করতে তার আর বাধবে না একটুও। নাজির প্রমাদ গুণল।

'শালারা বুঝি ওদিক দিয়ে আসবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে এল চেরাগ আলি, ইমানদ্দির ছেলে। বয়েস আঠেরো-উনিশ। হাতে গেঁটে বাঁশ। বনবনিয়ে ঘোরাচ্ছে মাথার ওপর। 'দেখি কোন শালা এগোয়। কার ঘাড়ে দুটো মাথা।'

জীবনে এই বোধ হয় প্রথম নাজির বেদখল হয়।

'দেখ, আমি আদালতের লোক, আইনের হুকুমে এসেছি।' নাজির ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'আমি তো আর তোমাদের শত্রু নই। পার যদি ওদেরকে ঠেকাও, ওদেরকে আসতে দিও না।'

ছল-চাতুরী জানে না, ইমানদ্দি জল হ'য়ে গেল। যে

মহামান্য অতিথি এসেছে তার ঘরে সে তার শত্রু নয়—এ-কথা সে অবিশ্বাস করে কি ক'রে ?

'কে, নাজিরবাবু ? আপনি ? আদাব ! আপনি আসবেন ? আপনি আসুন, কিন্তু আর কোন শালা যেন আমার পলটে না ঢোকে।'

'না, না, অন্য লোক আসতে পারবে না। তবে কিনা'—নাজির ঢোক গিলল, 'চাপরাশিরাও তো আইনের কাজ করে, ওদের আসতে দোষ নেই।'

'না, মহারাণীর দোহাই, ওদের আসতে কি দোষ ?'

'আর এ তো আমার মাঝি—'

'দেখুন বাবু, যে শালা খুশি আসুক, কিন্তু ঐ হারামজাদা নিশানদার যেন না আসে!' বলে ল্যাজা সোজালো করে ইমানদ্দি ভিড়ের দিকে তেড়ে গেল। যে যেদিকে পারল ছুট দিল। জমিদারের পেয়াদা কালা গাজী, যে নিশানদিহি করতে এসেছে, লুকোল কচুবনের আড়ালে।

নাজির ও চাপরাশিরা এক-পা এক-পা ক'রে চলে এসেছে বাড়ির বাইরের উঠোনে। হঠাৎ কি একটা ভারি জিনিস সজোরে কে ছুঁড়ে মারল তাদের সামনে। ত্রস্ত হয়ে দেখলে সবাই, তিনচার বছরের একটা নগ্ন শিশু।

যে ছুঁড়ে ফেলেছে সে ঐ মেয়েটারই মা, ইমানদ্দির স্ত্রী। বললে চেঁচিয়ে, 'কেটে ফেল্ ঐ মেয়েটাকে। থানায় নিয়ে চলে

যা সটান। দারোগাকে গিয়ে বল, মালেকের পেয়াদা-মির্দ্ধারা খুন করেছে আমার মেয়েকে। মেয়ে একটা গেলে আবার মেয়ে পাব, কিন্তু বাড়ি-ঘর গেলে যাব কোথায় ?'

ক্ষিপ্র হাতে নাজির তুলে নিল শিশুটিকে। আশ্বিনী জল ঢালতে লাগল। শিশু কাঁদতে লাগল 'মা' 'মা' বলে।

যেন কি সর্বনাশ ঘটতে বসেছে। কালবোশেখীর ঝড়, না আশ্বিনের বন্যা! সব ওলোটপালোট ছারখার হতে বসেছে। যেন আগুন ধরে গিয়েছে চারদিকে। বাড়ির মধ্যে স্বরু হয়েছে মহামারের তাণ্ডব।

কি করবে দিশে পাচ্ছে না ইমানদ্দি। কখনো পাগলের মত সারা গায়ে কাদা মাখছে, গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকছে, রক্ত বের করে ফেলছে, কখনো বা আঁজলা করে কাদা থেকে জল তুলে খাচ্ছে। গলিত পুঁজের মত খিস্তি-খেউড় করছে। আর তাগবাগ নেই, ছোট ভাই বশিরদ্দি এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করছে আর লাঠি হাঁকড়াচ্ছে।

ইমানদ্দি আর বশিরদ্দির আলাদা ঘর, উত্তরের ভিটে আর পশ্চিমের ভিটে, সীমানা ভাগ করা। আলাদা হাঁড়ি, আলাদা দাখিলা, আলাদা চৌকিদারি ট্যাকসো। কিন্তু আজ যখন বিদেশী শত্রু তাদের ঘরের দরজায় উপস্থিত, তারা দু'ভাই আজ এক বাপের ছেলে, তারা আজ রাম লক্ষ্মণ।

কিন্তু সমস্ত আক্রোশ তাদের ঐ জনতার উপর। যারা মজা

দেখতে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে আর পালপার্বণ নেই, দুর্গাডুবি নেই, পূর্বের সেই জেল্লা-জমক উঠে গেছে, তাই এরা এসেছে এখন উচ্ছেদ দেখতে। কি করে একটা গোটা সংসার উচ্ছন্নে চলে যায় মুহূর্তের মধ্যে। কি করে সমর্থ স্বামী তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝখানে!

'শালাচ্ছেলেরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি এখানে? এ বাড়ি তোমাদের—না আমার?' ইমানদ্দি আবার তেড়ে গেল জনতার দিকে। বশিরদ্দি একতাল কাদা ছুঁড়ে মারল।

জবিরউদ্দিন বাধা দিয়ে বললে, 'কি কর ছেলেমানুষের মত! নাজির সাহেব যে এদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। দখল হোক বা না হোক, তাঁকে একটু বসতে দাও। তোমাদের একটা নাম-ডাক আছে, মান-ইজ্জত আছে, মাথা খারাপ করে সব খোয়ালে নাকি আজ? ভদ্রতাটাও ভুলে যাবে? তোমার মেয়েটাকে কোলে নিয়ে এত আদর করছেন আর তুমি এমন বেকুব, তাঁর একটু খোঁজ-খবর করছ না? আহম্মক কোথাকার!'

ইমানদ্দির যেন হুঁস হল। বেপরোয়া গালি ছুঁড়তে লাগল ছেলে চেরাগ আলিকে উদ্দেশ করে, 'শালার পো শালা, মেহমানকে বসতে দিতে পার না? ও মাগী করে কি? ও-ও তো বসতে দিতে পারে। সব ক'টাকে আজ খুন করব।' ইমানদ্দি ছুটল এবার ঘরের দিকে।

'আরে কর কি!' জবিরউদ্দিন তার হাত ধরে ফেলল,

'নাজির সাহেবের সঙ্গে কথা কও, যাতে কাজ হবে। মাথা ঠাণ্ডা কর।'

'মাথা ঠাণ্ডা করবো! ঐ শালার ছেলেদের যেতে বলেন শিগগির। আমি ভিটেছাড়া হব, আর ঐ শালারা তাই দেখবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?' বলে ইমানদ্দি আবার মার-মার করে উঠল।

'থাক না দাঁড়িয়ে ওরা। কতক্ষণ থাকবে?'—নাজির বললে প্রবোধের সুরে, 'শেষকালে হয়রান হ'য়ে ফিরে যাবে এক সময়।'

একটা মোড়া ও খান কয়েক পিঁড়ি নিয়ে এল চেরাগ আলি। মেয়েটা নাজিরের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল চেরাগ আলির কোলে।

'একটু তামাক আনতে পার?' গলা নামিয়ে জিগগেস করলে অশ্বিনী।

'তামাক-টামাক নেই। বসতে দিয়েছি এই বেশি।' গর্জে উঠল ইমানদ্দি।

'কি বাজে বকছ আহম্মকের মত।' জবিরউদ্দিন মুরুব্বি-মাতব্বরের মত বললে, 'এক ছিলিম তামাক তুমি কাকে না দাও শুনি? একটা বৈঠক-সালিশ কোথাও বসলেই তো তামুকের শ্রাদ্ধ।'

এমনি সময় বাড়ির পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল বশিরদ্দি। বলছে, 'ওরা বেড়া খুলে আসবে—'

'কি?—বেড়া খুলবে? ও শালার পো চেরাগালি, দেখি তো আমার গুলিবাঁশটা।' ইমানদ্দি হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

চেরাগ আলি লাফিয়ে পড়ল গুলিবাঁশটা নিয়ে।

জবিরউদ্দিন কেড়ে নিল বাঁশটা। বললে, 'চোখে কিছু আর তোমরা দেখতে পাও না। কে খোলে তোমার বেড়া ? আমরা এখানে সবাই বসে আছি, আর আমাদের সামনে কার হবে অমন আস্পর্দা ? একটু বোস চুপ করে।'

কে কার কথায় চুপ করবে! ইমানদ্দির পরিবার বড় মেয়েটাকে হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। অন্য হাতে তার গাছ-কাটা দা। মেয়েটার বয়েস সাত-আট, রঙিন ছোট একখানা শাড়ি পরা। মুখে এতটুকু ভয় নেই। উজ্জ্বল চোখ-দু'টো টলটল করছে।

'ওরা বাড়িতে ঢুকলেই কিন্তু এই দা বসিয়ে দেব তোর গলায়। পারবি ?' মা বললে মেয়েকে।

মেয়েটা টলল না। গলায় দা বসালে তার কি হবে কিছু বুঝলও না হয়ত। শুধু এটুকু বুঝেছে বিদেশী শত্রু তাদের বাড়ি-ঘর কেড়ে নিতে এসেছে। এ বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেয়া হবে না কিছুতেই। শত্রুকে যে করে হোক বাধা দেওয়াটাই এখন বড় কাজ। তার কাছে বাঁচামরাটাও তুচ্ছ। তাই সে বললে স্পষ্ট গলায়, 'পারব।'

নাজির অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। পকেট থেকে ক্যামেরা বের করে তুলে নিল ওর ফটোগ্রাফ।

মুখে বিষণ্ণতার ভাব এনে বললে অশ্বিনী, 'তোমাদের মেয়ে,

তোমরা কাটলে আমাদের কি হবে? একটা বিহিত করব ভেবেছিলাম, তা তোমরা আর করতে দিলে না।'

'কিসের বিহিত?' ইমানদ্দি তেড়েফুড়ে উঠল: 'বিহিত নেই। বেশি তেরিমেরি করবে না বলে দিচ্ছি। যাকে পাব তাকে মেরে বসব।' বলেই সুরু করলে গালাগাল।

'তা হলে নেহাৎই একটা গোলমাল বাধাবে দেখছি।' জবিরউদ্দিনও তেরিয়া হয়ে উঠল, 'বন্দুক ধরুন তো নাজির সাহেব দেখি ওদের কতদূর ক্ষমতা। বলছি যে দখল দেব না, তবু কেবল গালিগালাজ করে।'

'যাক, ওতে যদি ও শান্তি পায় তো করুক।' নাজির নির্লিপ্তের মত বললে, 'বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়া তো আর চারটিখানি কথা নয়। বলি ও ইমানদ্দি, তামাক-টামাক দেবে না একটু?'

'শালার পো শালারা তামাক দেয়নি এখনো?' ইমানদ্দি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে গ্যাদা, কি করিস বাড়ির মধ্যে? তোর মাও তো এক কলকি তামাক দিয়ে যেতে পারে। সে শালী করছে কি?' বলে সে আবার স্ত্রীর উদ্দেশে ছুটল।

অশ্বিনী বাধা দিয়ে বললে, 'ওদিকে গিয়ে কি লাভ? এদিক পানে থাক, কেউ যেন আসতে না পারে। তামাক দিয়ে যাবেখন।'

'কি, এদিকে লোক আসবে?' ল্যাজার মাথা দিয়ে খানিকটা

জায়গায় ইমানদ্দি কুণ্ড তৈরি করল। তার মধ্যে বসে পড়ে আবোলতাবোল মন্ত্র আওড়াতে লাগল, 'দেখি কার সাধ্য বাড়িতে ঢোকে।'

গ্যাদা তামাক নিয়ে এল। তুষের আগুন দেওয়া এক কলকি তামাক, কলকিটা ডাবা হুঁকোর মাথায় বসানো। এক হাতে হুঁকা, অন্য হাতে দা। তার বয়স বারো-তেরো; কিন্তু সেও সশস্ত্র। শত্রুকে ঢুকতে দেবেনা তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। সেও প্রতিরোধ করবে।

'আরে, তোর হাতেও অস্ত্র! বেশ বেশ, কেউটের বাচ্ছা কেউটে হবি না তো কি!' নাজির এক গাল হাসল, 'বলি পান-টান খাওয়াবি, না, শুধু মুখেই বাড়ি ফিরব? যা, আমাদের খাবার-দাবার জোগাড় কর গিয়ে, দু'টো মুরগি জবা দে।'

ছেলেটা একটাও কথা বলল না। একটু হাসল না। মুখ গম্ভীর করে চলে গেল।

উত্তরের ঘরে লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে আছে, তার একটা হদিস করা দরকার।

'কিগো, একটু পানি দেবে খেতে?' এই বলে জবিরউদ্দিন ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। দেখতে লাগল ইতি-উতি। ইসারায় জানাল নাজিরকে, ও-সব মিথ্যে কথা।

বাইরে তখন প্রায় চার-পাঁচশো লোক জমা হয়েছে।

রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ঘণ্টা দুই। তারা আর কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে তীর্থকাকের মত।

নাজির একটা সিগারেট ধরাল। এদিক ওদিক ঘুরতে-ফিরতে লাগল। বলতে লাগল : 'না, এমন সুন্দর বাড়িঘর, এও মানুষে ভাঙতে চায়।' ইমানদ্দির পরিবার দরজার গোড়ায় বসে আছে দা হাতে, তাকে লক্ষ্য করে বললে, 'শোনো মা, মালিকের সঙ্গে একটা মীমাংসা কর। আমি আছি, আমি দিই মীমাংসা করে।'

'আর কিসের মীমাংসা। এক থোকে গেল বার টাকা দিছি আশিটা, এবার দিছি একশো বারোটা, তার উপরে আরো টাকা চায় দুইশো। কি করব কও, জমি খাই দশ কুড়া আর এই বাড়িটা।'

'তোমাদের খাজনা কত?'

'চব্বিশ টাকা।'

'কার হাতে টাকা দিয়েছ বলতে পার?'

'পারি না? খুব পারি। আমি আর উনি দু'জনে মালিক-সেরেস্তায় গিয়ে নায়েবের কথামত কালা গাজীর হাতে টাকা দিয়ে এসেছি। গুনে গুনে দিয়ে এসেছি, একটি একটি করে। সেই কালা গাজী আজ এসেছে আবার দখল নিতে।'

'নায়েবের হাতে দাওনি কেন?'

'তাই চেয়েছিলাম দিতে, কিন্তু নায়েব বললে, ওর হাতে দাও।

নিশ্চয়ই একটা কিছু অভিসন্ধি ছিল। হয়ত বেশি টাকায় আর কাউকে পত্তন দেবে, দুরন্ত প্রজা সরিয়ে বাধ্য প্রজা বসাবে। তাই টাকায় কোন আসান হয়নি। খাজনার ডিক্রি হয়েছে। নীলেম হয়েছে। বাঁশগাড়ি দখল হয়েছে। তবু টাকা দেয়ার সত্যের জোরে নড়েনি ইমানদ্দি। পরে হয়েছে এই খাসদখলের ডিক্রি। হয়তো আছে কেউ আড়ালে-আবডালে। পত্তন নেবে বলে আগে থেকে সেলামী দিয়ে রেখেছে। শত চাপ দিলেও ইমানদ্দির সাধ্য নেই সে টাকার নাগাল পায়।

কে জানে, যা বলছে, তাই সব সত্যি কিনা। গরিব হলেই সে সত্যবাদী হয় না। প্রজা হয়েও সে উৎপীড়ক হতে পারে।

হোক সে অবাধ্য, হোক সে মিথ্যাবাদী, হোক সে দেনদার, তবু সে তার বাড়ি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে যাবে—এর মধ্যে বিচার কোথায়!

লোকে চুরি-ডাকাতি করে, মেয়ে ফুসলায়, তবিল তছরুপ করে, জেল হয়, জেল খেটে ফের তার বাড়ি ফিরে আসে। তার বাড়িঘর লোপাট হয়ে যায় না। আর এ লোকটা হয়ত খাজনা বাকি ফেলেছে। গাফিলি করেই হোক বা দুর্বৎসরের জন্যেই হোক, খাজনা দিতে পারেনি। সে কি চুরিডাকাতির চেয়েও খারাপ? আর তারি জন্যেই সে নির্বিবাদে বাড়ির বার হয়ে যাবে!

'আচ্ছা মা, আমরা এখন যাই। ভাত তো আর খাওয়াবে না, একটু পান-টান যদি খাওয়াও।' নাজির হালকা সুরে বললে।

ইমানদ্দির স্ত্রী সবাইকে বারান্দায় বসতে বললে। বলে সে চলে গেল ভিতরে। একটি থালায় করে কটা পান, কিছু কাটা সুপুরি ও সামান্য চুণ-খর এনে দিলে। নাজির পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'এবার তা হলে আসি। এমন ভাবে বিনা দাখিলায় টাকা-পয়সা আর দিও না।'

'আর দেব কোনো দিন? মরে গেলেও না।'

'তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়। কিন্তু কি করব? পরের চাকরি করি, পরের হুকুমে আমাদের চলতে হয়। আজ আর দখল হবে না বটে কিন্তু মালিক কি ছাড়বে? হয়তো এর পর পুলিশ নিয়ে আসবে। সে যে তখন কি কাণ্ড হবে কেউ বলতে পারে না।'

'একটা কিছু বুদ্ধি দাও বাবা, কি করি।' ইমানদ্দির বউ শূন্য, হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কি বুদ্ধি দেয়া যায় তাই বোধ হয় নাজির ভাবছে, হঠাৎ সোরগোল উঠল। শোনা গেল, ইমানদ্দির দুই শালা পাশ-গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে দখল ঠেকাবার জন্যে, কিন্তু ভিড়ের থেকে কারা আগে থেকেই তাদেরকে ঠেকিয়ে দিয়েছে, ছুটে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

নাজির বন্দুকে গুলি ভরবার ভঙ্গি করল। দেখল, হু'টো প্রমত্ত জোয়ান লোক ভিড় ছত্রখান করে দিয়ে বেরিয়ে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর নানা দিক থেকে তাদেরকে আটকে রাখছে জনতা।

বন্দুক বাগিয়ে ধরে নাজির বললে, 'এক পা এসেছ সীমানার মধ্যে, গুলি করব বলে রাখছি। কেউ আসতে পারবেনা, তোমরাও না—ওরা দু'জনও না।'

সবাই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু ইমানদ্দি বোঝবার লোক নয়। তখন থেকে সে তার কুণ্ডের মধ্যে বসে মন্ত্র আওড়াচ্ছে আর ছক কাটছে আঙুলের নখ দিয়ে। তার মন্ত্র-তন্ত্র এবার সব উড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল: 'আমার আত্মীয়স্বজনকে আমার বাড়ির মধ্যে কে ঢুকতে দেবে না? কার ঘাড়ে কটা মাথা?' হাতের কাছে ল্যাজাটা খুঁজে পেল না ইমানদ্দি। কুণ্ডে বসে মন্ত্র জপবার সময়ই কায়দা করে অশ্বিনী সেটা সরিয়ে রেখেছে।

দিগ্বিদিক না ভেবেই ইমানদ্দি খালি হাতে লাফিয়ে পড়ল জনতার উপর তার আত্মীয়দের ছিনিয়ে নিতে। আর যেই সে ঢুকে পড়ল সেই জনতার ব্যূহে, অমনি তাকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলল নায়েবের লোক।

ঘরের মধ্যে ঢুকে চেরাগ আলিকে চেপে ধরল জবিরউদ্দিন। ইমানদ্দির স্ত্রী কোনো জখম করে না বসে তারি জন্যে তার হাত

বেঁধে ফেলা হল গামছা দিয়ে। তু-তুটো পিওন গ্যাদা আর বড় মেয়েটাকে পাহারা দিতে লাগল।

'শালা তুটো কোথায়?' নাজির জিগগেস করল

'সব্বাইকেই তো তখন থেকে শালা বলছে। কার কথা বলছেন?' পাকা ভুরু তুলে প্রশ্ন করল অশ্বিনী।

'পাশ-গ্রাম থেকে যে লোক তুটো শেষকালে ছুটে এল

'কেউ আসেনি।' অশ্বিনী বললে স্থির কণ্ঠে।

'কেউ আসেনি?'

'না। শুধু একটা রব তুলে দেয়া হয়েছে। যাতে ইমানদ্দিকে টেনে আনা যায় ভিড়ের মধ্যে। হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাতে তাকে ঘায়েল করা যায় সহজে।' অশ্বিনী চোখ টিপল।

সবাই হাসতে লাগল স্বচ্ছ মনে।

ওদিকে চক্ষের পলকে মিস্ত্রিরা কাজ প্রায় সমাধা করে এনেছে। খুলে ফেলছে চালের মটকা, খুলে ফেলছে টিন। নায়েবের ভাড়াটে লোকেরা হাতে-হাতে মালামাল সরিয়ে মজুত করছে এনে সীমানার বাইরে। সমস্তটা কেমন আস্তে আস্তে ফাঁকা, শাদা হয়ে যাচ্ছে।

একটি মেটে কলসীতে সামান্য কটি চাল। তাই সরিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে দেখে বড় মেয়েটা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'চাল কটিও যে ওরা নিয়ে যায়! তবে আমরা খাব কি ওবেলা?'

ইমানদ্দির স্ত্রী একটিও আওয়াজ করল না। ইমানদ্দি বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বাইরের উঠানে। উপুড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে। দিনের দিকে আর তুলে ধরবে না তার মুখ।

কিন্তু বশিরদ্দি ?

'সর্বনাশ, বশিরদ্দি গেল কোথায়?' নাজির বিবর্ণমুখে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাকে কে আটকেছে? সে কার নজরবন্দী?'

'ভয় নেই, সে কারু নজরবন্দী নয়।' বললে জবিরউদ্দিন।

'তার মানে?'

'তার মানে, সেও মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজে লেগেছে। ঘর ভাঙছে, জিনিস সরাচ্ছে।'

'কে, বশিরদ্দি?'

'হ্যাঁ, সেই নিয়েছে এ জমার নতুন বন্দোবস্ত। সেলামি দিয়েছে পাঁচশো টাকা। ঐ, ঐ যে বশিরদ্দি।'

বশিরদ্দির হাতে ল্যাজা-লাঠি নয়, হাঁড়িকুঁড়ি, হাতা-খুন্তি, কড়া-গামলা। রান্না-ঘর ভাঙা হয়ে গেছে, তার মাল সরাচ্ছে সে এখন। সরা-সানকি, দেরখো-কুপি।

এখান দিয়ে যাচ্ছিল, শুনতে পেল কথাটা। হাসতে হাসতে বশিরদ্দি বললে, 'হ্যাঁ বাবু, ষোল আনাই এবার আমার হল।'

তার চকচকে দাঁত সে আর ঢাকল না ঠোঁট দিয়ে।



করিম বক্সের বাড়িতে কলেরা লেগেছে। কলেরা হয়েছে তার বড় ছেলে ইয়াসিনের।

ভাটির দেশ। খাল-বিল, নদী-নালা, খানা-খাত। আর ঢালাও ধানখেত। পালকি-ডুলি নেই, গরুর গাড়ি নেই। আছে শুধু নৌকো। নানান রঙের নানান রকমের। কোষ আর ঘাসী, ডোঙা আর দোনা, পানসি আর শামপান। গ্রামের নাম নৌবহর।

খোড়ো চালের মসজিদ আছে একখানা। কিন্তু মক্তব-মাদ্রাছা নেই। নেই ডাক্তার-কবিরাজ। গো-বদ্যি বা একটা হাতুড়ে পর্যন্ত দেখা যায় না।

থাকলেও ডাকত না কেউ। মুন্সি মোল্লার দেশ, কাজ হয় পীরের ফতোয়ায়। তাই এখানে চলে ফকিরের চিকিৎসা।

গলায় আজমিরি পাথরের মালা, গায়ে লাল শালুর ফতুয়া, পরনে তেমনি লাল কৌপিন, হাতে তফসি জড়ানো, মাথায়

জাপসি, হাতে আঁকাবাঁকা কালো আশা। কে ও? ফকির সাহেব। করেন 'কি? ফকিরালি করেন, ওলা-শীতলার চিকিৎসা করেন, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চালান করে দেন মহামারী। ভীষণ জোরমন্ত লোক। মহাপুরুষ।

করিম বক্স গৃহস্থি করে। বাড়ির লপ্ত জমি, মোষের হাল আছে তু'খানা। মোটা টাকার মালগুজারি করে। জমি দশ কানি, প্রায় আশি বিঘে। হালিয়া রাখেনা, ছেলেরাই চাষ করে। সেই বড় ছেলেরই আজ কলেরা।

মেজ ছেলে জয়নাল চলেছে ফকিরের তালাসে।

বাড়ির সবাই যে যার ঘরে বন্ধ হয়ে রইল পাছে 'ওবাকোবা'র চোখ পড়ে তাদের উপর। হাতনেয় হোগলা বিছিয়ে শোয়ানো হল ইয়াসিনকে। শুধু করিম বক্সের ফুপু রইল তার তদবিরে। ও বুড়ি, ওর আবার দাম কি।

ফকিরের নাম কালে খাঁ। খোদাতালার এবাদতে সারা রাত গাঁজা টেনেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে ঘুমিয়েছে একটু। হঠাৎ জয়নাল এসে তার পায়ে পড়ল।

'চাচামিয়া, বড় বিপদ।'

'সবই খোদাতালার ইচ্ছা। বিপদে না পড়লে কি কোনো শালা ফকিরের তুয়ারে আসে?' কালে খাঁ চোখ কচলে হাই তুলল: 'শালারা এখনো বোঝেনা যে আসমান-জমিন সকলি ফকিরের বরকতে ঠিক আছে। ফকির যদি তার দোওয়া-তুরুদ

ছেড়ে দেয়, একদিনেই সারা দুনিয়া ছারখারে যায়। কেউ বুঝলে না ফকিরের কেরামতি।'

'আর ভুল হবে না চাচামিয়া।' জয়নাল কাকুতি করে উঠল: 'আমরা গুনাগার লোক, আমাদের অপরাধের সীমা নেই।'

'কি, কি করতে হবে? তোদের বাড়ি যেতে হবে নাকি?'

'এক্ষুনি, এক্ষুনি চাচামিয়া। যা দেখে এসেছি আছে কিনা ঠিক নেই। সন্ধে-রাত থেকেই ভেদবমি সুরু হয়েছে। খিল ধরেছে হাতে-পায়ে, চোখ ডুবে গেছে ভিতরে, গলায় কথা সরে না। ভাইসাবকে বাঁচান, চাচামিয়া।'

কালে খাঁ ধমক দিয়ে উঠল, 'আগে করছিলি কি হারামজাদা? যমরাজা যদি এসেই থাকে তাকে ফেরানো কি সোজা? আসতে পথ দিলি কেন? রওনা হবার আগেই তো পথ আটকে দেওয়া যেত। মন্ত্র পড়াতে নিয়ে যাস না কেন বছর-বছর?'

'অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে—গুটির ব্যারামে গরু মরল দুটো—'

'বেশ, ঠেলা বোঝ এবার। এবার মানুষ নিয়ে টানাটানি। একজনের থেকে আর ক'জনের হয় তার ঠিক কি। ফকিরের মন্ত্র চারটিখানি কথা নয়, ফুঁ দিলে পাথর পর্যন্ত উড়ে যায়—'

সন্দেহ কি, আগে মন্ত্র পড়িয়ে রাখলে এমন দুর্দশা আর হত না। আর এমন গাফিলতি করবে না তারা। ধারকর্জ করতে হলেও বছর-বছর ফকির ডেকে এনে স্বস্তেন করাবে।

'আপনার চরণে আমাদের অনেক কসুর, চাচামিয়া।' জয়নাল কাঁদ-কাঁদ গলায় বললে, 'আমরা এবার থেকে খুব হুঁসিয়ার হব। এ যাত্রা আমাদের বাঁচান।'

'ওরে, বাঁচানো কি আমার হাতে? সব খোদাতালার মর্জি। আচ্ছা, দাঁড়া দেখে নিই, পাষাণী মা কোনখান দিয়ে ঢুকেছে তোদের বাড়ি। আমাকে না জানিয়ে কেন, কোন সাহসেই বা ঢুকলে? রক্ত খাবি তো আমাকে বললেই পারতিস। দাঁড়া, বেটি, তোর সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে।' বলে কালে খাঁ চোখ বুজল।

ধ্যানে বসে রইল প্রায় পাঁচ মিনিট। ঘাড় হেলিয়ে হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু। মনে-মনে কার সঙ্গে যেন মোলাকাত হচ্ছে।

'ঠিক আছে।' চোখ লাল করে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল কালে খাঁ। বললে, 'পাশের ঘর থেকে আমার সাকরেদকে ডাক।' বলে আবার চোখ বুজল।

কালে খাঁর চেলা বিলাতালি।

সে এসেই তম্বি সুরু করল, 'মুখের কথায়ই ফকির মিলবে? বলি, বক্স সাহেব টাকা দেবে কত?'

'কুড়ি টাকা বলে দিয়েছে।' বললে জয়নাল।

'ওসব চালাকি-চামারি এখানে চলবে না। পয়লা রুপী পঞ্চাশ, দোসরা রুপী তিরিশ, তেসরা কুড়ি টাকা। এর কম

আর আমাদের ফি নেই। তাও, যদি এক বাড়িতে হয়। তিন রুগী একশো টাকা।'

জয়নালের আর প্রতিবাদ করবার সময় নেই। বললে, 'পঞ্চাশ টাকাই দেবে বাজান। জানের চেয়ে জমিজিরাত কি বেশি?'

বিলাতালি তবু ধমক দেয়। বলে, 'তা তো নয়, কিন্তু আল্লাওয়ালা আদমির কাছে যে খালি-হাতে আসতে নেই তাও জানোনা? দরগা-বাড়িতে যে কিছু দিতে হয় তা বুঝি তোমাকে কেউ বলে দেয়নি? তোমাদের ওখানে গিয়ে তবে হবে কি? খোদা নারাজ। তদবিরে কোনোই কাজ হবেনা।'

জয়নালের মুখ শুকিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সাহস করে বললে, 'টাকা এনেছি আমি।'

'কত?'

'ফকিরদের দরগা-বাড়িতে চেরাগ দেবার খরচ পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা।'

'আর শুক্রবারের সিন্নি?' কালে খাঁ চোখ না মেলেই হুংকার দিলে।

'তার জন্যে সাত টাকা সাত পয়সা।' তাও এনেছি।'

'আর জিলিপি-সন্দেশ?' বিলাতালি জিগগেস করলে।

'পথে হাট-বাজার পড়েনি, মাঠপথ দিয়ে চলে এসেছি পাগলের মত '

'তবে তারো দামটা রাখো বাবার পায়ের কাছে। বলো, বাবা, পথে জোটেনি, তাই পারিনি আনতে, আপনার যা খেতে ভালো লাগে তাই কিনে যেন বিলিয়ে দেন এতিম-মুসাফেরদের।'

মিষ্টির জন্যে তিন টাকা, মোট পনেরো টাকা সাত আনা জয়নাল রাখল ফকিরের পায়ের কাছে।

কালে খাঁ চোখ খুলল। হুম-হুম করতে করতে বললে, 'চারদিকেই পাষাণীর নজর পড়েছে। তবু ভয় নেই, আমার নামও কালে খাঁ। বেটিকে আজ একটু ভাল করেই শিক্ষা দিতে হবে। আর একটু সবুর কর, দিলটাকে একটু তাজা করে নিই। নে, একটু আগুন কর, বিলাত।'

গাঁজা আর ধুতরো এক সঙ্গে মেড়ে কলকেতে সাজাল কালে খাঁ। নারকোলের ছোবড়ার আগুন আনল বিলাতালি। ছোবড়াটা পুড়ে যেতেই কালে খাঁ কলকেতে টান মারল পুরো দমে। এক টানেই গাঁজা নিঃশেষ হয়ে গেল।

বিলাতালির হাতে কলকেটা চালান দিতে-দিতে বললে, 'তোর এখনও দু'টান লাগে।'

'আমি যে সাকরেদ।' নতুন করে নিজের জন্যেই কলকে সাজাতে বসল বিলাতালি।

দুই জনে বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে চলে এল করিম বক্সের বাড়িতে।

এখনো রোল ওঠেনি কান্নার। জয়নাল কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, 'এখনো বেঁচে আছেন ভাইসাব।'

'থাকবে না তো যাবে কোথায়?' কালে খাঁ ঘাড়ের একটা গর্বিত ভঙ্গি করলে: 'বেটি খুব চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন যে ঝুঁটি চেপে ধরব তার ঠিক নেই।'

দুই জনে প্রথমে বাড়ির চারদিকটা একবার ঘুরে এল।

'শালার পো শালাদের কত বার বলেছি এই হেজি-গাছগুলো যেন থাকে না বাড়ির ধারে-কাছে—এই দেখ ঘরের সঙ্গে কাউ-গাছ। সাধে কি আর বেটির নজর পড়েছে? এখন তো গাছ কাটা দূরের কথা, একটা পাতাও ছেঁড়া যাবে না।' এই বলে কালে খাঁ কিড়মিড়-কিড়মিড় মন্ত্র আওড়াতে লাগল।

লোক জমতে লাগল আস্তে-আস্তে। স্বয়ং বৈদ্যনাথ যখন এসে পড়েছে তখন 'ওবাকোবা' আর কিছুই করতে পারবে না। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে তারিফ করতে লাগল।

'এমন মুরিদ দেশে থাকতে আমরা এর হুজুরখানায় একটু সিন্নিও দিই না, একটু চেরাগীও দিই না। পাঁচ ওক্ত শুধু নামাজ পড়লেই কি হয়?' নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে সবাই আফশোষ করে।

কি মন্ত্র আওড়াচ্ছে কালে খাঁ তার অর্থ বোঝে এমন সাধ্য কার। বুঝলে আর সেটা মন্ত্র কি! দু'একটা বোধগম্য শব্দ ছিটকে বেরিয়ে আসছে—যেমন, কামরূপ, কামাখ্যা, চাঁদপুর,

মেহেরকালী, খাজাবাবা, আগাবাবা, সোলেমান নবী,—তাইতেই আরো গদগদ হয়ে উঠেছে জনতা।

'ঐ পথ, ঐ পথ দিয়ে এসেছে পাষাণী—' কালে খাঁ আঙুল দিয়ে ঈশান কোণ দেখিয়ে দিল। লাফ মারল হুংকার ছেড়ে।

বিলাতালিকে বললে কুণ্ডুলী দিতে। ফকিরের কি-কি লাগে আগেই জানা আছে সবাইর। জ্বালানি কাঠ, ধূপধুনা, দীপ আর চন্দন—সবই জোগাড় হয়েছে। জোগাড় হয়েছে বড় তামাকের।

জ্বলে উঠল কুণ্ডের কাঠ।

'ঠিক আছে। বেটির জিভ লকলকিয়ে উঠেছে। খিদে খুব বেশি হয়েছে, না? দাঁড়া, রক্ত দিয়ে আসি।' কালে খাঁ বলতে-বলতে এগিয়ে এল রুগীর পাশটিতে।

এবার ডোর দিতে হবে রুগীকে।

কালে খাঁ তার ঝুলি থেকে কয়েকটা কাঁচের টুকরো বের করল। ইয়াসিনের বাঁ হাতটা কসে বাঁধলে গামছা দিয়ে। কাঁচের টুকরো দিয়ে হাতটা চিরে-চিরে ফেললে। ফালা দিলে প্রায় দশ-বারো জায়গায়। টিপে-টিপে বার করলে রক্ত।

কলজেতে খানিক বল্ পেলে কালে খাঁ। বললে, 'আর চলবে না বেটির ভেলকি। নে, খা চুষে-চুষে। চলে যা নীল দরিয়ার পারে।'

দুপুর গড়িয়ে গেল দেখতে-দেখতে।

রুগী এখনো ঝিম মেরে আছে। টেঁসে যায়নি। কেউ-কেউ বলছে, সুরাহা হয়েছে। নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে নাকি সুতোর মত।

'তবু এখনো জিগির টানিনি।' কালে খাঁ বীরের মত ভঙ্গি করলে।

প্রায় পাঁচ শো নল দূরে জামসেদ মোড়লের বাড়ি। সেখানে খিচুড়ি পাকালো বিলাতালি। নতুন হাঁড়ি কিনিয়ে আনলে। খেলে কলাপাতায়।

কেউ কোথাও নেই বুঝে গলা নামিয়ে জিগগেস করলে কালে খাঁ: 'কিরে, মোটে একজনই নাকি?'

'না, না, আরো হবে।'

'কোথায়?'

'ঐ বাড়িতেই হবে।'

'আর কখন হবে! এক-দুপুর তো কেটে গেল।' কালে খাঁ হতাশার সুরে বললে, 'এক বাড়িতে আট-দশটা হবে, গোটা কতক বাঁচবে গোটা কতক মরবে, তবেই বরং বলা যাবে, ফকিরের কুদরত। কিন্তু একটা হয়ে একটাই যদি টেঁসে যায় মান বাঁচাবি কি করে? মজুরিই বা পোষাবে কেন?'

'কিছু ভয় নেই আপনার।' চোখ ঘোরালো করে বললে বিলাতালি, 'ওদের বাড়িতে একটা মাত্র ডোবা। সেই ডোবার জলই ওরা খায়, ধোয়াপাখলার সমস্ত কাজ করে। ভয় নেই,

সেই ডোবায় ধুয়ে দিয়েছি ইয়াসিনের একখানা কাঁথা। এক-এক করে সব পড়বে এবার।'

'তবেই রক্ষে।' নিশ্চিন্ত গ্রাসে গিলতে লাগল কালে খাঁ: 'অনেকটির হলে দু' একটি বেঁচে যাবে আপনা থেকেই—এই অদেষ্টের নিয়ম। সেই দু-একটিতেই ফকিরালি কায়েম থাকবে আমাদের। নইলে অবস্থা বড় সুবিধের নয়।'

ইয়াসিনের অবস্থা খারাপ হল সন্ধের পর থেকেই।

কালে খাঁ হুংকার দিয়ে উঠল : 'নিশ্চয়ই কেউ ছুঁয়ে ফেলেছে ইয়াসিনকে। নইলে অমন তাজা চেহারা ফের মিইয়ে গেল কেন? তিরতিরে নাড়ি ডুবে গেল কেন?'

কেউ ছোঁয়নি ইয়াসিনকে। করিম বক্সের ফুপু কখন চলে গিয়েছে পর্দার হেপাজতে। তবু কারু সাহস নেই অস্বীকার করে। কেউ না ছোঁবে তো ইয়াসিন অমন বেহাল হয়ে পড়ল কেন?

কালে খাঁ কখনো কুণ্ডে বসে, কখনো পাগলের মতো বাড়ির চারিদিকে ঘোরাফিরা করে। কখনো এ-গাছটা ধরে ঝাঁকি মারে, কখনো ও-গাছটা থেকে পাতা ছেঁড়ে। তার পরে জিগির টানে। কু, কু, কু—। কালে খাঁর দম ফুরিয়ে যাবার আগেই বিলাতালি খেই ধরে। কু—।

'মিয়াসাবরা, যত পারেন পানি খান, ঘটি-ঘটি পানি খান।' কালে খাঁ সহুংকার হুকুম দেয় : 'সময় বড় খারাপ, ঝাঁকে-ঝাঁকে

ছুটে আসছে ওবাকোবার দল। আর কার মধ্যে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। আমি মন্ত্র আওড়ে দিচ্ছি,—'সবাই শুধু পানি খান বারে-বারে। ছেলে-ছাবাল জরু-বেটি সবাই—'

কলসী গড়িয়ে সবাই জল খেতে লাগল।

কিন্তু আর কারুরই কলেরা দেখা দিল না। শুধু ইয়াসিনই মারা গেল শেষ রাত্রে।

ফকিরের জারিজুরি সব মিথ্যে! করিম বক্স তেরিয়া হয়ে উঠল। তাড়িয়ে দে ওদেরকে। সিন্নি-চিরাগীর টাকা সব ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

'সব খোদাতালার মর্জি। মানযে কি করতে পারে?' গাঁয়ের মাতব্বরেরা কেউ-কেউ সান্ত্বনা দিতে চাইল করিম বক্সকে, কিন্তু সে কিছুতেই কান পাতবে না। ফকিরালি ব্যর্থ হতে পারে এ তার ধারণার বাইরে। তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে ওদেরকে।

'ব্যাপার কি বিলাত?' বাড়ির বাইরে গাছের ছায়ায় বসে গাঁজায় দম দিতে-দিতে জিগগেস করে কালে খাঁ: 'আর একটারও হল না যে?'

'বেজায় ঠকে গেছি!' বিলাতালি আপশোষের ভঙ্গিতে বললে, 'যে ডোবায় ইয়াসিনের কাঁথা ধুয়েছি, পরে শুনলাম, সে-ডোবার পানি নাকি ওরা খায় না। ওরা খায় হাওলাদার সাহেবের পুকুরের পানি।'

'এঃ-হেঃ-হে!' কালু খাঁ মাটিতে কলকে রেখে হাত রাখলে কপালের উপর: 'এমন সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেল! কলেরার আবার দেখা পাব কবে! এ বছরটা শেষে উপোস করেই কাটাতে হবে?'

'ভয় নেই, পাশ-গ্রামে চালান করে দিয়েছি।' বিলাতালির চোখ-মুখ জ্বলে উঠল উৎসাহে: 'নাগরপুর গ্রামে একটার বেশি দুটো পুকুর নেই।'

কিন্তু তার আগেই যদি জেল্লা-জলুস ধুয়ে যায় এখান থেকে? বক্‌স-সাহেবের লোকেরা যদি মার দেয়?

মার দেয়া অমনি মুখের কথা? দস্তুরমত সব পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিতে হবে। একটার উপর দিয়েই যে গেল, আর-কাউকে যে পাষাণী ছুঁলো না—সেই খানেই তো ফকিরের বাহাদুরি। সারা রাত জিগির টেনে ঝাড়ফুঁক করে মন্ত্রপড়া জল খাইয়ে আর-সবাইকে বহাল-তবিয়ত রেখেছে। সেটা ফেলনা হল? ফকির না এলে বক্‌স-সাহেবের সংসার লোপাট হয়ে যেত।

তাই বলা হল করিম বক্‌সকে। কিন্তু সে টলবে না কিছুতেই। আর এক পয়সাও সে দেবে না ফকিরের হাতে।

যুক্তি-তর্ক অনুনয়-বিনয় তিরস্কার-শাসন কিছুতেই তাকে ঘায়েল করতে পারল না। তার বড় ছেলে মরেছে এর বেশি আর কিছুই তার অনুভব করবার নেই। বলবার-বোঝবার নেই।

'আর সব ছেলেরা যে আস্ত-সুস্থ আছে সে কার বরকতে?' জিগগেস করলে কালে খাঁ।

'সব খোদাতালার দাওয়ায়। ফকিরের কাণাকড়িরও মুরোদ নেই।' করিম-বক্স নিশ্চল।

'আমার ক্ষমতা তুমি জাননা বক্স-সাহেব? আমার ফুঁয়ে পাথর উড়ে যায়, মরা গাছে পাতা গজায়, শুকনো মাঠে বৃষ্টি নেমে আসে। ভাঙন-নদী ফিরিয়ে দিলাম সেদিন, ষ্টিমার ঠেকিয়ে দিলাম জলের থেকে চর তুলে দিয়ে। হকের পাওনা চুকিয়ে দাও বলছি, নইলে তোমার সংসারে, তোমার সমস্ত গাঁয়ে পাষাণীকে লেলিয়ে দেব।' কালে খাঁ লাল চোখ ঘোরাতে লাগল।

'এতই যখন তোমার ক্ষমতা তখন আমার মরা ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও।' বললে করিম বক্স: 'আগে নিজের চুক্তি রাখ, পরে টাকা নাও। শুধু কোকিল ডেকে লাভ কি?'

এমন সময় খবর এল নগরপুরে কলেরা লেগেছে। ফকিরকে নিতে এসেছে নগরপুরের লোক।

কালে খাঁ প্রকাণ্ড লাফ মারল।

'নগরপুরের লোকেরা যদি চাঁদা দেয় ঝুলি ভরে, কলেরাকে ফের চালান করে দেব নৌবহরে, আর এই বক্সমিয়ার বাড়িতে। তবে আমার নাম কালে খাঁ।' আশা ঘোরাতে-ঘোরাতে কালে খাঁ চলে গেল নাগরপুরের দিকে। ঝুলিঝোলা নিয়ে পিছে-পিছে বিলাতালি।

করিম বক্স বসে রইল গুম হয়ে। ফকিরের ক্ষমতাই যদি থাকত তবে ইয়াসিন আর মরত না। খোদা নিয়েছে বলেই গেছে। আর যদি কাউকে নেয়, খোদাই নেবে। করিম বক্স তার করবে কি।

চরে করিম বক্সের দোয়ালা ঘর ছিল একখানা। সেইখানে সবাইকে পাঠিয়ে দিলে। বাড়িতে সে একা রইল। আর তার বুক জুড়ে রইল ইয়াসিনের শূন্যতা।

ফকিরের ক্ষমতাই যদি সে বিশ্বাস না করে তবে সবাইকে সে পাঠিয়ে দিল কেন? কিছুতেই মন থেকে অস্বস্তিটা দূর করতে পারে না। রাত্রে থেকে-থেকে ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠে।

ছিপ-ছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকারে মাটি খুঁড়ছে তু'জন, বিলাতালি আর কালে খাঁ। মাটির তলা থেকে কি রহস্য তারা উদ্ধার করছে তা কে জানে।

'এই যে। পাওয়া গেছে।' উল্লসিত হয়ে বললে কালে খাঁ, 'তুই ধর গিয়ে পায়ের দিকে, আমি ধরছি এই বগলের তলায়।'

তু'জনে টানাটানি করে ইয়াসিনের মৃতদেহটা বার করে আনল কবরের তলা থেকে। ধরাধরি করে লাশ নিয়ে চলল করিম বক্সের ঘরের দাওয়ায়। লাশটাকে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসানো হল। শক্ত করে কাঠ ও বাঁশের ঠেকো দিয়ে দিলে যাতে না ঘাড় গুঁজে পড়ে যায় কাৎ হয়ে।

সকালবেলা করিম বক্‌স ঘরের দরজা খুলেই দেখে— ইয়াসিন। মাটির তলা থেকে উঠে এসেছে।. হেঁটে এসেছে। বসেছে ঠেসান দিয়ে। বাপের কাছে তার জবাব চাই। একি অধর্ম! একি বেইমানি!

তখুনি লোক ছুটল ফকিরের কাছে। দলে-দলে লোক ছুটল।

'আসবেই তো উঠে, বারে-বারে উঠে আসবে।' কালে খাঁ বীরের মত বলতে লাগল: 'মরেও ওর শান্তি নেই। মাটির ঠাণ্ডাতেও ওর ঘুম আস্‌ছেনা। কি করেই বা আসবে? ওর বাপ যে ফকিরের টাকা গাপ করেছে। যত বার গোর দাও ততবার ও উঠে-উঠে আসবে। টাকা না ফেলে দিলে পাচিত্তির নেই।'

'আপনাকে সেলাম দিয়েছেন বক্‌স-সাহেব।'

কালে খাঁ যেতেই করিম বক্‌স অবাক্যব্যয়ে পঞ্চাশটাকা বের করে দিল।

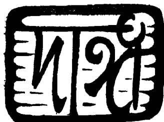
'কি, বলেছিলাম না ফিরিয়ে আনব তোমার ছেলে? কেমন? জিগিরের টানে উঠে এসেছে কিনা কবর থেকে?' কালে খাঁ বুক ঠুকতে লাগল: 'কি, ক্ষমতা নেই এই ফকির-ফোকরার?'

'আর, আরো নিন এই দশটাকা। বাছাকে আপনি নিজ হাতে গোর দিয়ে আসুন।' করিম বক্‌স কাঁদতে লাগল: 'আমার অধর্মের জন্যে তার যেন না আর লাঞ্ছনা হয়। আপনি

মুরিদ, মহাপুরুষ, আপনার ক্ষমতা আগে কিছুই বুঝতে পারিনি। অধমকে মাফ করুন—' করিম বক্স কালে খাঁর পা জড়িয়ে ধরল।

হাত তুলে দোওয়া করল কালে খাঁ। ভয় নেই, সে আর তার সাকরেদ ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে গোর দেবে ইয়াসিনকে। তার ঘুমের আর ব্যাঘাত হবেনা।

আর নাগরপুর থেকে রোগ এবার চালান যাবে নৌবহরে নয়, উত্তরে, কুশডাঙায়।



শিশেখাল। এপারে আদম-পুর ওপারে ধুলেশ্বর। দুই গ্রাম। মাঝখানে অনেক আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল ছিল একটা। তার কাঠ আর লোহা দুই গ্রামের লোক চুরি করে নিয়েছে। এখন শুধু একটা দুই-বাঁশের সাঁকো। বাঁশের ধরুনি আছে উপর দিকে। হেলে-বেঁকে।

কাঁকালে কলসী, চলেছে মমিনা। ত্যাড়াবেঁকা সাঁকোর উপর দিয়ে। ধরুনি না ধরেই। হাতে খোঁটা-দড়ি, চলেছে জেন্নাতালি, তেমনি নন্নড়ে সাঁকোর উপর দিয়ে। তেমনি ধরুনি না ধরেই।

এপারে পুকুর, ওপারে গোবাট। গরু আগেই হেঁটে পার হয়ে গেছে খাল, জলের থেকে নাকের, তুলতুলে ডগাটা উঁচুতে তুলে ধরে। নদীর জল লোনা, পুকুরের জল ছাড়া খাওয়া যায় না। গরুকে খোঁটায় বেঁধে না রাখলে কার ক্ষেতের ফসল কখন তছরুপ করে।

মমিনা আর জেন্নাত। ধুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর।

দু'জনে দেখা হল মুখোমুখি।

মমিনা বলে, 'পথ দাও।'

জেন্নাত বলে, 'পিছু হটো।'

মমিনা বলে, সে মেয়ে, তার দাবি সকলের আগে। জেন্নাত বলে, তার দাবি মমিনার আগে, কেন না সে আগে এসে সাঁকো ধরেছে। পথ এগিয়ে এসেছে আদ্ধেকেরও বেশি। এখন সে আর ফিরে যাবে না। এমন কোনোই নুটিশ টাঙানো নেই যে মেয়ে দেখলেই সাঁকোর থেকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

'হ্যাঁ, দিতে হবে। আগুনে পর্যন্ত দিতে হবে।' চোখ ঝিলকিয়ে বললে মমিনা। কলসীটা ঢলে পড়ছিল, কোমরের খাঁজের উপর তুলে চেপে ধরল আঁট করে। বাঁকা বাহুর বন্ধনীতে ফোটালে বা একটু নবযৌবনের ভরিমা।

'আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না-হয় পানিতে দেব।' জেন্নাতালি বললে।

'পথ ছাড়ো বলছি। রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় এটা।' ঝলসে উঠল মমিনা: 'যদি না ছাড়ো তো বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।'

'আমিও বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলতে পারি।'

'কি বলবে তুমি?'

'বলব মকবুল মুছুল্লির মেয়ে মমিনা বলেছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'ওমা, কখন বললাম !'

'ঘরে নয়, বলেছে, আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'দেবই তো একশো বার। নুড়ো জ্বেলে দেব।'

'তাই বাজানদের বললে লাভ হবে না, দাঙ্গা বেধে যাবে দুই বাপে। আমার মুখে জ্বলুক নুড়ো, ক্ষেতি নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাও, মমিনা।'

মমিনা চোখ নামাল। বললে, 'হাসির গল্প নেই, তবু হাসি কি করে? শুধু শুধু কারু ফরমায়েসে হাসা যায়?'

'চাঁদ কি কারু ফরমায়েসে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—'

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল রুপুলি চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল জিন্নাৎ। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী ভেঙেছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম গফুরালি। সে বলে, আমার ভাঙা জমি আবার ভেসে উঠেছে। শিকলজরিপ করে জমি ভাঁউরে নিলেই বোঝা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যে কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির লপ্ত, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্ক-বিতর্ক। মন-কষাকষি। শক্রতালি। পক্ষাপক্ষি।

দু' পক্ষের জমিদার দু'পক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দিয়ে মামলা বসিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছনে থেকে উস্কে দেয় ঘন-ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়-জোড় লাগে, অনেক কাঠখড। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া এই নিয়ে সল্লা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনঝাউ।

এক দিকে আদমপুর, অন্য দিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। দেওয়ানি আদালতের ফেরফার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাজা-লাঠির তদারক করে। আমি হামি হব, বলে গফুরালি। মকবুল বলে আমি হামি হব। লাঠিতে তেল মাখায়, ল্যাজার মুখে শান পড়ে। সুরু হয় বুঝি হামলা হামল্লি।

পালিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উড়ি ধান। সমর্থ হয়ে উঠেছে আবাদের জন্যে।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দু'দিকে। গাজী-গাজী। ঢাল-সড়কি, বর্শা-বল্লম, ল্যাজা-লাঠি, কোঁচা-টাঙ্গি, দা-কুড়ুল দু'দিকেই ঝকমকিয়ে উঠল। চরের দখল নিয়ে বাধে বুঝি হাঙ্গামা।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি, ধুলেশ্বরের মোড়ল মকবুল।

দু'জনেরই হাল-হালুটি বিস্তর, পাকা ভিতের উপর টিনের ঘর অনেকগুলি। তাঁবেদার লোক-লস্করের অভাব নেই। মোড়লে-মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে-দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

অক্‌ হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি, দাঙ্গাফ্যাসাদ। হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিশে এত্তেলা দেবেনা কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও রাজি। বুকের মাংসের চেয়ে দামী যে জমি, সেই জমির চেয়েও মান বড়। স্বত্বের চেয়েও বড় হচ্ছে দখল।

উলু মাঠ ভেঙে চাষ স্বরু করে দিল জিন্নাত। লাঙল দি'লই খড় ভেঙে-ভেঙে যায়। মাটি ফেটে-ফেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-তিয়ারে দরকার নেই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে-দলে। পাখা-মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মত।

গফুরালি হুকুম দিলে, কোর্ট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। দখল যখন নিয়েছি একবার, বেদখল হতে পারব না। ওরা হটে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আমাদের গায়ের বস্ত্রের মত জমি কামড়ে-পড়ে থাকব।

উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ-করা শানানো লৌহমুখ, উড়ল অনেক ধুলোমাটি, ফিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত,

ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেয়ার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে।

হেরে গেল গফুরালির দল। ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। চম্পট দিল খাল-নালা সাঁতরে। কিন্তু জিন্নাতালি ফিরল না।

জিন্নাতালি আটক পড়েছে শত্রুর কব্জার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা করতে চাও তো করো গে, কিন্তু তার আগেই গুম হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুছুল্লির। দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল করতে দাও বারো বছর। রাজি হও তো ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো, কচুকাটা করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে-পায়ে-কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লাকড়ি-ঘরে। শুকনো হোগলার উপর।

রাত গহিন, ঝিঁঝি ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোছা-মোছা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিন্নাতের। তার জ্বরো কপালের উপর কার মিঠে হাতের ছোঁয়া।

'কে ?'

'আমি গো আমি। মমিনা।'

স্বরের মিঠানিতে জ্বর জুড়িয়ে গেল গায়ের। যেন স্বপন দেখছে, স্বপন শুনছে জিন্নাত।

'জখম হয়েছে তোমার ?'

'লাঠি লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের উপর। ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে দু'হাত। বেতাগী ল্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারেনি বুকের মধ্যে।'

'এইখানে লেগেছে ?' হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে বাহুর উপর।

'এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।'

সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা ব্যথা-বেদনা যেন উবে গিয়েছে এক পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন-ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু।

দড়ির গিঁট খুলে দিতে লাগল মমিনা।

'এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে ?'

'হ্যাঁ,' ছোট-ছোট আঙুলে বিন্দু-বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে-ঢেলে মমিনা বললে, 'এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। প্রথম রাতে সর্দার-চাঁইরা হল্লা-ফূর্তি করেছে। জবরদখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিপক্ষদের। তার উপরে কয়েদ করেছে ও-দলের সাজোয়ানের ছেলে। কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি।'

'এ কি, ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে? জানতে পারলে তোমার কী সর্বনাশ হবে জানো?'

'জানতে পারবে না।'

'পারবে না মানে?'

'মানে, জানতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না আমার।'

'তা কি করে বলছ?'

'বলছি, আমিও ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব।'

'চলে যাবে? কোথায়?'

'বল্লভপুরের কাজীর কাছে। জানো তো, কাজী কুরমান মোল্লা আমার খালু। নদীর দু' বাঁক পরেই বল্লভপুর।'

'সেখানে কি?'

'সেখানে গিয়ে কাজীর দরবারে কাবিননামা রেজেস্ট্রি করব। তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে। তুমি দুলহা আমি দুলহান।' কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।

গায়ের রক্ত শিন্-শির করে উঠল জিন্নাতের। বললে, 'তোমার বাপ-চাচা রাজি হবে?'

'না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে। আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো

বছর পেরিয়ে গেছি আমি। তা আমি সাবিদ্ করতে পারব। আমাদের বিয়ে তুড়তে পারবে না কেউ।'

'বিয়ে হবে আমাদের?' ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপন দেখছে জিন্নাত?

'হ্যাঁ, তোমার খেদমতে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে দু' পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলছে আমার, আর তোমার বাজান বলছে তার, সে-চর তারা দুয়ে মিলে আমাদের দুজনকে জায়গীর দিয়ে দেবে। নাইয়র যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু'গ্রামে ফিরে আসবে মিল-মহব্বত। তা ছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকালই দু'দল কেবল মারামারি করবে, আমার মনের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি!'

'কি করে যাবে, মমিনা?' জিন্নাত উঠে বসল।

'ঘাটে ডোঙা আছে মাছধরার। তাতে করে পালাব।' কালো চোখে আলো জ্বলল মমিনার।

'আমার হাত যে ভাঙা। নৌকো বাইবে কে?'

'আমি দাঁড় টানব। তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না?

'পারব।'

'তবে চলো। নদীর নাম আঁধারমাণিক। আঁধার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।'

ছুজনেই ত্রস্ত হালকা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নিচে নৌকো বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

'হাল-দাঁড় কই?' জিগেস করলে জিন্নাত।

'ও!' বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা-সোটা হয়েছে দাঙ্গার উরদিশে। বললে, 'তুমি একটু বোসো। উঠোনে মুলি-বাঁশ আছে, তাই ছুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব ছু'জনে। তুমি যদি না পার আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে।' মমিনা ফিরে গেল।

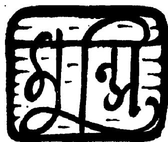
এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গাম-হুজ্জুতের, আক্রোশ-আক্রমণের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে! এত হুড়দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, চোটজখম, এত রক্তপাত—সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ভুলে যেতে হবে হার-মার, ঘায়ে মলম লাগাতে হবে মোলাম করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা?

কিন্তু উপায় কি। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি, এ যে মমিনা। নদীর নামে তারও নাম। সে যে আঁধারমাণিক।

ছোট দেখে ছুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে, জিন্নাত নেই, ডোঙাও নেই। ছু' হাতে-জল কেটে-কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ঐ দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধার-মাণিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিন্নাতের ছু' হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে?



তদন্তে দারোগা-দফাদার আসে। ঘুষ নিয়ে চলে যায়। খাজনা আদায় করতে আসে জমিদারের তশিলদার, খাজনার ওপর নিয়ে যায় নজরানা। আসে মহাজনের মুহুরি, আসলে মুসমা না দিয়ে সুদ নিয়ে যায় উশুল করে।

যে আসে সেই লুটে নেয়। শুষে নেয়। থাবা মেরে নেয়।

কিন্তু এবার যে এসেছে সে নিতে আসে নি, দিতে এসেছে। আর এমন জিনিস দিতে এসেছে যা যতই দেবে ততই বেড়ে যাবে।

দিতে এসেছে বিদ্যা। আর যে এসেছে তাকে সবাই বলে, মুন্সি! গাঁয়ের লোক বলে 'পণ্ডিত সাইব'।

বাঙলা দেশের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটা চর—নাম চর-গর্জন। গর্ডন ছিল, উচ্চারণ-ভ্রংশে গর্জন হয়েছে।

শুধু অঢেল ধান-খেত। একটা পাঠশালা নেই। মক্তব-মাদ্রাছা নেই। বেশির ভাগই মুসলমান চাষা। অশিক্ষিত। গরিব। ঠগের হাতে লুটের জিনিস।

সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে নির্বোধ করে রেখেছে, গরিব করে

রেখেছে। যাতে মহাজন পায় সুদ, জমিদার পায় খাজনা, মোকদ্দমার টল্লিরা পায় মুনফা।

'ও সোনার বাপ, আরে কর কি?'

'হাত্তনায় বসিয়া তামু খাই। ক্যান, এ দিকে আও।'

'তোমার সোনা কই?'

'খ্যাতে গ্যাছে। ক্যান, হ্যারে ক্যান?'

'হালাদার বাড়িতে পূবপাড়িয়া একজন মুন্সি আইচে, পোলাপান পড়াইতে। খুব সাচ্চা মানু—পাঁচ ওক্ত আজান দিয়া নোমাজ পড়ে। পোলাপানও দশ বারুগ্‌গা জোটছে। ল্যাহায়-পড়ায় বোলে খুব বালো। আমার ইজুরে পড়াইতে দিতাম। তয় কি না ও একলা যাইতে চায় না—'

'হ্যার আমি কি করমু?'

'তোমার সোনারে যদি দিতা তয় আমার ইজুও যাইতে পারতে।'

সোনার বাপের চোখ হঠাৎ খুলে গেল। তার সোনা লেখা-পড়া শিখবে! আর কিছু না, চাকরি-বাকরি না, হাকিম-বাদশা না, সে পড়তে পারবে হাতের লেখা, ছাপার অক্ষর—দস্তখৎ করতে পারবে চোখ বুজে।

দুই প্রতিবেশী বন্ধু বসে গেল দুঃখের কথা কইতে। একই হুঁকোতে মুখ ঠেকিয়ে-ঠেকিয়ে।

খতে টিপ দিয়ে কর্জ নিয়েছে তিরিশ টাকা, শেষে শুনল তিরিশের জায়গায় লেখা আছে একশো তিরিশ। গোমস্তা এসে চার সনের খাজনা নিয়ে রসিদ দিয়ে গেল, পরে ফের তারি মধ্যে থেকে দু'সনের জন্যে নালিশ ঠুকলে। উকিলকে গেল রসিদ দেখাতে। কোনটা যে রসিদ, কোনটা যে আর্জির নকল, কোনটা বা নুটিশ—তা পর্যন্ত চেনে না! রসিদ বেছে নিয়ে উকিল বলে দিলে, দু'সনের মোটে উশুল পড়েছে। জমির স্বত্ব-দখল পরচায় রেকর্ড হয়, আদালতে পড়াতে গিয়ে দেখে, কখন পাশ-জমির লোক চড়াও হয়ে লিখিয়ে নিয়েছে নিজের নামে। শুনে এমন তাদের অবস্থা, তারা জমিনেও নেই আসমানেও নেই।

কেবল ঠকেছে। কেবল পিছু হটেছে। কেবল ছেড়ে দিয়েছে দায়-দাবি।

কিন্তু সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলিকে তারা ঠকতে দেবে না। পাথুরে অন্ধকারের কুঠুরিতে ফোটাবে দু'একটা আলোর ফোকর।

'টাহা-পয়সা লাগবে নাকি?'

'টাহা-পয়সা মায়না-বুতা কিছুই লাগবে না। রোমজান মাসে শুধু সন্ধ্যাকালে এক বেলার খোরাকি দিলেই অইবে। আর হগল রাত্রিরে খাইবেও না। দাওয়াত খাইবে বাড়ি-বাড়ি। রোমজান মাসে একজন মুন্সি-মোল্লারে খাওয়াইলে কত গুণা মাপ হয় হ্যা জান না?'

'আর দুই-এক টাহা মায়না লইলেই বা খেতি কি? শুধু যদি দলিল-রসিদ পড়তে পারে, ঘুমের মধ্যে আঙুলের টিপ না চুরি যায়, তয় আমাগো পোয়ারা কেল্লা মারেলে—'

কামেল হাওলাদার ধানের বাজারে মজা মেরে বড়লোক হয়েছে। হয়েছে সম্ভ্রান্ত। নিজের দলিজ-ঘরের বারান্দায় মক্তব বসিয়েছে। গাঁয়ের ছেলে-পিলে বাপ-চাচাদের সে একজন ভারিক্কি মুরুব্বি।

'বিদেশ তিয়া আইয়া যদি এ দেশী পোলাগুলারে একটু মানুষ করিয়া দ্যান, তয় দ্যাশ-সুদ্দা আল্লার নাম করবে।'

মুন্সি এক গাল দাড়ি দুলিয়ে বললে, 'এ্যা কয়েন কি হুজুর! আমি আপনাগো মধ্যে আইচি কিছু এলেম দিতে, হেলেমও কিছু দিতে চাই! আমাগো দেশী মানষে ল্যাহাপড়া আর খোদার কালাম ছাড়া কিছু জানে না। হেইয়া জাহের করতেই আই বছর-বছর—'

তবু দশ-বারোটির বেশি ছেলে জুটলো না।

'বাজান, আমি যামু, আমি পড়মু।' চাষার ছেলেপিলেরা লাফালাফি শুরু করে।

বাপেরা চটে ওঠে কেউ-কেউ। 'হগোলডি পণ্ডিত অইলে চাষ করবে ক্যাডা? গরু বান্দবে ক্যাডা? খ্যাতে পান্তাভাত ল্যাবে ক্যাডা?'

ছেলেরা তবু মানতে চায় না। কেউ কেউ নতুন শেলেট-পেন্সিল, নতুন বই কিনেছে দেখে কাঁদাকাটি করে।

'ছোড জাতের লাইগ্যা ছোড কাম। এ আল্লাই লেইক্যা থুইছে।'

'তয় হ্যারা ক্যান যায়?'

এমন কি এ গ্রামের, সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি।

'হ্যারার বাপ-মায়ের হাউস অইছে। পোলা দুইডা ল্যাষ অইবে জ্বর অইয়া। এই তোগো মুই কইয়া থুইলাম। ছোড-লোকের ল্যাহাপড়া হিকতে গ্যালেই ঠাইট মরণ।'

মুন্সি বাড়ি-বাড়ি ছেলে খুঁজে বেড়ায়। আরবি-পারসি পড়, দোয়া-দুরুদ পড়, কোরান-কেতাব পড়। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ভাষা, বাঙলা ভাষা শেখ।

'বিদ্যা না অইলে দুন্নাই মিত্যা।'

হাওলদার সাহেবের বৈঠকখানার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে স্কুল বসে। মাথায় কিস্তিটুপি, পরনে লুঙ্গি—ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি, সাত-আট বছরের ছেলে। বসে মুখস্থ করে—অ, আ, ই, ঈ—। স্লেটের ওপর দাগা

বুলোয়। পেন্সিলের লাঙল চলে সাদা শ্লেটের খেতে। দুই বন্ধু পাকা ধানের স্বপ্ন দেখে।

মুন্সি বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসে ফরসি টানে। এবার কি রকম ফসল হয়েছে মাঠে তার হিসেব নেয়।

সন্ধ্যে হলেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি নিমন্ত্রণ আসে। মিলাদ-সরিফের নিমন্ত্রণ।

'আর দ্যাহো, বাড়ির মদ্যে বেশি কিছু জোগাড় করতে নিষেধ করিয়া দিও, কইও, মুন্সি-সাহেব মানা করিয়া দেচে। এ দেশে বালো ঘি পাওয়া যায়, ঘির বানানিয়া অল্প কিছু অইলেই অইবে। আর দ্যাহো, যদি মোরগ-টোরগ জবা দিয়া না থাহে, তয় যেন আর জবা দেয় না। আমি বোজদে পারচি, খরচ উনি আইজগো অনেক করচে—হাড়েগোনে এত দুদ আনন, এত মিডা আনন ঠিক অয় নাই—'

'না মুন্সি-সাহেব, আমরা গরিব মানু, বেশি-টেশি কি আর জোগাড় করমু। তৌফিক-মতো অল্প কিছু জোগাড় করচি।'

'খোদার নামে দানধ্যান করলে যেমন বালো হয়, কিছু খাওয়াইতে পারলেও বালো অয়।'

পুণ্যের লোভ দেখিয়েছে মুন্সি, আরেক বাড়িতে ডাক পড়ে। আবার আরেক বাড়ি। আগের বাড়ি যা খাইয়েছে পরের বাড়ি তার চেয়ে বেশি খাওয়াবার সরঞ্জাম করে। চলে গ্রাম্য প্রতিযোগিতা।

বিদ্যা যেমন অনেক হজম করেছে মুন্সি, তেমনি খাদ্যও সে অনেক হজম করতে পারে।

কিন্তু শুধু খেয়ে পেট ভরে না। নগদ টাকা চাই।

হাওলাদার সাহেব রাষ্ট্র করে দিল, কিছু মাইনে দিতে হয় মুন্সিসাহেবকে।

'বিনা মায়নায় অ-আ তামাইত অইছে। অহন আকার-ইকার হিকতে অইলে টাহা লাকপে দুইডা।'

এন্নি মধ্যে তাড়াতাড়ি যদি নাম-দস্তখৎটা শিখতে পারে, অনেকে রাজি হয় মাইনে দিতে।

অনেকে আবার হয় না। দুটো টাকা কি কম?

'মায়না আনছ রে করিমের পো?'

'মনে আছলে না।'

'হ্যা থাকপে ক্যান? মনে থাকপে বাইচের লাও আর মামলার তারিখ। তুই আনছ রে ফালাইন্যার পো?'

'আমাগো বড় ঠ্যাহা।'

'মায়নার বেইলে ঠ্যাহা। তিন হান বিয়া করতে তো ঠ্যাকপানা। তুই আনছ রে রাজাউল্লোর ব্যাডা?'

সোনাউল্লা নতুন রাজার মাথার টাকা বের করে দেয় দুটো। দেয় ইজ্জত আলিও। অদ্ভুত চকচকে। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে

করে। তবু অনায়াসে দিয়ে দেয় দুই বন্ধু। এতটুকু মায়া করে না। তারা লেখা-পড়া শিখবে।

হামিদের বাপ এসে হাজির।

'মায়নার কতা তো আক্কে খুব কইচেন। পোলা আমার হ্যাকলে কেমুন?' বলে একটা দলিল ছেলের কাছে মেলে ধরল। 'এ-দলিলটা পড় দেহি?'

হামিদ বললে কাঁচুমাচু হয়ে, 'এ প্যাচ ল্যাহা পড়তে পারমু না।'

'তয় অইছে। বাড়-তে ল, আর ল্যাহন-পড়নে কাম নাই।' ছেলেকে নিয়ে সটান কেটে পড়ে হামিদের বাপ।

কিন্তু সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি টিঁকে আছে ঠিক। আকার অবধি শিখেছে, যদি আরো বেশি কিছু মাইনে দিয়ে ইকার-উকার একার-ওকারটা শিখে নিতে পারে, তাতেও তারা রাজি আছে।

রোমজানের মাস ফুরিয়ে আসে। মুন্সির ফিরে যাবার দিন আসে ঘনিয়ে।

আজ ঈদ। গ্রামে আনন্দ আর ধরে না। শত্রু-মিত্র নেই, ইতর-ভদ্র নেই, ধনী-দরিদ্র নেই, সবাই আজ ভাই-ভাই। কেউ ছাগল কেউ মুরগি জবাই করে, তৈরি করে ফিরনি-পায়েস, কোর্মা-পোলাউ। রোজার ফেতরা, রোজার মানত সবই আজ

মুন্সি-সাহেবের। গ্রামের ধর্মের খাজনা-আদায়ের সেই তশিলদার।

সোনার ধান ফলেছে অজস্র, তাই ভারা-ভারা নিতে লাগল মুন্সিসাহেব। ছাত্রের মাইনে, ধর্মের মুনফা, মহত্ত্বের মাশুল। পরের বছর যে ফের আসবেন তার দাদন দিয়ে রাখতে হয় আগে থেকে। কত বছরই তো কেউ আসে নি। ইনি যদি তবু এক বছর পরে আসেন! যদি আবার একটু উস্কে দেন পলতেটা।

'যদি আল্লাতালা বাঁচায়, সামনের বছর আপনাগো খেদমতে দাখিল অমু। পোলাপানগুলারে রাইখ্যা যামু, ওগুলা আবার সোমস্ত বুলিয়া না যায়।'

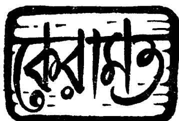
ধান-বোঝাই নৌকো ছেড়ে দেয় মুন্সি-সাহেব। চলে যায় গঞ্জের হাটের দিকে। সোনাউল্লা আর ইজ্জত আলি পারে দাঁড়িয়ে থাকে। ভয় নেই, বছর পরে আসবে আবার মুন্সি-সাহেব। আবার সেই আমনের দিনে।

না, ভুলবে না সোনাউল্লা। ভুলবে না ইজ্জত আলি। সোনাউল্লা 'সনা' পর্যন্ত শিখেছে। আর ইজ্জত আলি শুধু 'ই'।

বছর ঘুরে আসে। আবার ধান ফলে। কিন্তু মুন্সি সাহেবের আর দেখা নেই। শোনা যায় সে এবার গেছে চর আণ্ডারে—মানে য়্যানড্রু সাহেবের চরে। সেখানে সে খুলে বসেছে ধান-বেতনের মক্তব।

ইজ্জত আলি মাঠে পান্তা নিয়ে যায়। সোনাউল্লা গরু বাঁধে। আর মাঝে-মাঝে নদীর দিকে তাকায় এই মুন্সি-সাহেবের নৌকা এল বলে।

সেই নৌকা প্রকাণ্ড জাহাজ হয়ে উঠবে এক দিন। আর সেই জাহাজে চড়ে তারা দুই বন্ধু সুদূর সমুদ্রে পাড়ি দেবে—দিকদিগন্ত ছাড়িয়ে চলে যাবে দূর-দূরান্তের দেশে।



আকাট মূর্খ, কিন্তু বউ পেয়েছে খুবছুরৎ।
নাম মেহেরজান।

যখন সাদি হয়, তখন সাত-আট বছরের মেয়ে। সাদামাঠা, একহারা চেহারা! দেখতে-দেখতে সাত-আট বছরের মধ্যেই বদলে গেল ছিরি-ছাঁদ। এ নয় যে ডাঁসালো হল, জোয়ার এলে সব গাঙেরই জল ভরে—আসল কথা, সুন্দর হয়ে উঠল মেহেরজান। উলুমাঠ ছিল, হয়ে উঠল তেজালো ধানখেত।

ভাগ্যিস, ছোট থাকতে বিয়ে করেছিল কেরামত। নইলে, এই ভরন্ত বয়সে তাকে সে ঘরে আনতে পারত নাকি? তার কথা বলতেই মেহেরজান নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে নাক সিঁটকে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে যেত পর্দার আড়ালে। তবুও, পিড়াপিড়ি করলে, মোটা মোহরানা চাইত। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, কেরামত দেনমোহর দেবে কোত্থেকে?

ক্ষুদ্দুর প্রজা—মোটে এক কুড়ো জমি। কোলরায়ত। ডিক্রির তিরিশ দিনের মধ্যে বছরের খাজনাটা না দিয়ে দিলে উচ্ছেদ হয়ে যাবার ভয় থাকে। তাই সব সময় এক পায়ে

খাড়া থাকে কেরামত কিন্তু পেটই চালাতে পারে না, খাজনা দেবে কোত্থেকে। বড় তার ক্ষীণ অবস্থা।

ধান কড়ারে হালিয়ার কাজ করে। খন্দ উঠে গেলে নৌকো বায়। ফাড়ন-চিরনের কাজ করে। কুলি খাটে। তবু হাটের থেকে মেহেরজানকে একটা ছাপার শাড়ি কিনে দিতে পারে না।

বড় সাজবার সখ মেহেরজানের। ইচ্ছে করে কোমরে গোট পরে, কপালে সিতাপাটি। রঙচঙে ছিটের কাঁচুলি আঁটে। চুলটা বিনুনি করে বাঁধে আর জরির একটা ঝাপটা ঝুলিয়ে দেয়।

কিন্তু তা না, রাঁধে বাড়ে, ভানাকুটা করে, কাঁকালে করে জল টানে। চুলে একটু ফুলেল তেল নেই, কানে দুটো দুলও চিকচিক করে না।

বলে, 'আমাদের এ হাল কি বদলাবে না কোন দিন?'

'খোদা বলতে পারেন।' জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে কেরামত।

এমদাদ হাওলাদারের চোখ পড়েছে মেহেরজানের উপর।

এমদাদের বিস্তর অবস্থা। তিন সংসার। আগের দু' পরিবার বেঁচে নেই। তৃতীয়টা যেটা আছে সেটা যেন শেওড়া গাছের পেত্নী। চুলগুলি শণের নুড়ি, গাল দুটি চড়িয়ে-ভাঙা। সম্পত্তির জন্যে বিয়ে করেছিল তাকে। যাকেই সে বিয়ে করে তার থেকেই জায়দাদের আয় খোঁজে।

কিন্তু মেহেরজানকে দেখলে আর সম্পত্তির কথা মনে হয় না। মনে হয় সাম্রাজ্যের কথা।

প্রায় হাজার বিঘে জমি আছে এমদাদের। টিনের ঘর আছে ছ'খানা। গরু-মোষের হাল আছে আটখানা। বাড়ির নিচে ঘাট আছে বাঁধানো। নৌকো আছে তিন নম্বর। মাছ ধরবার জন্যে দোনা, মাল বইবার জন্যে কোষ আর হাওয়া খাবার জন্যে বজরা। বেশ মানাত মেহেরজানকে। যার তিনখানা নৌকো, আটখানা হাল আর ছ'খানা ঘর, তার ঘরের ঘরণী হয়ে।

তা ছাড়া তার তেজারতি আছে। বাজার আর তত তেজী না থাকলেও নগদ টাকা বের করে দিতে পারে সে কয়েক হাঁড়ি। রুপায়-সোনায় মুড়ে দিতে পারে মেহেরজানকে। অমন হাঘরে-হাবাতের মত দিন কাটাতে হত না। কোথায় দাসী-বাঁদি তাঁবে-দারি করবে, তা না, কুলোয় করে চাল ঝাড়ে, শামুক ধরে হাঁস খাওয়ায়, খুচান জালে মাছ ধরে।

সাপের মাথায় না হয়ে মণি জ্বলছে দেরখোর উপর।

তারা খাঁ এমদাদের এক্তারী লোক। কেরামতের মালেক। তাকে কোটনা করলে এমদাদ।

হাটের ফিরতি-পথে একা পেয়ে কথাটা ভাঙলে তারা খাঁ।

এমন অন্যায় কিছু বলছেন না হাওলাদার সাহেব। বলছেন, কেরামত তালাক দিক মেহেরজানকে। তার বদলে কেরামতকে তিনি পাঁচ বিঘে জমির রায়তিজোতের পাট্টা দেবেন। আর তার

উৎখাতের ভয় থাকবে না। পাকা-পোক্ত ঘর ·চায় একখানা, চোরেলের হাট থেকে টিন কিনে দেবেন দশ ভাঁজ।

'এ কি জুলুমের কথা?' কেরামত হতভম্বের মত বললে, 'এ কি জবরদস্তি? আইন-ধর্ম কি সব উঠে গেছে?'

ফোকলা দাঁতে হাসল তারা খাঁ। আইন-ধর্ম আছে বলেই তো চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছেন না। শাস্ত্র অনুসারেই কাজ করতে চাচ্ছেন।

'না, আমি আমার বউ ছাড়ব কেন?' কেরামত শক্ত গলায় বললে।

'তুই তো দেখছি একটা আস্ত বেকুব। জমি পাচ্ছিস, দখলি স্বত্ব পাচ্ছিস, ঘর পাচ্ছিস টিনের—আর চাই কি তোর? তার পর নিকে সাদি কর না কেন যতটা খুসি। এটা শুধু ছেড়ে দে।'

'আমি কিন্তু থানা-পুলিশ করব।' কেরামত তেরিয়া হয়ে উঠল।

'ওঁর সঙ্গে পারবি তুই?'

'এর আবার পারাপারি কি? নিজে বেঁচে আছি, তিনতালাক দিইনি, আমার বউ উনি জোর-জবর কেড়ে নিয়ে যাবেন? গরিব বলে এ জুলুমও আমাকে সইতে হবে?'

'শোন, রাগ করিসনে,' তারা খাঁ কেরামতের পিঠে হাত বুলুতে লাগল: 'মানী লোক, অমন কোনো কেলেংকারি করতে পারেন না সাহস করে। জেলের চেয়েও তাঁর বদনামের ভয়

বেশি। তুই শুধু আলগোছে ওকে তালাক দে, আইনমাফিক ওকে তিনি নিকে করুন। নগদ টাকা চাস—'

'না। পারব না। ও আমার বুকের হাড়, কলজের রক্ত।'

'শোন—'

তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল কেরামত। মেহেরজানকে সব কথা খুলে বললে।

'মুড়ো ঝেঁটে দিতে হয় মুখে।' রাগে মেহেরজান রি-রি করে উঠল, 'পঞ্চাশ বছর প্রায় বয়স হতে চলল, আদ্ধেক দাড়ি পেকে গেছে, মিন্সের আহ্লাদ দেখ না। আমার কাছে এলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে আচ্ছা করে বসিয়ে দি ঘা কতক!'

'তোকে যদি মুখে কাপড় বেঁধে জোর করে টেনে নিয়ে যায়?' কেরামতের চোখে ভয়ের ঘোর লেগেছে।

গেলেই হল? চৌকিদার দফাদার নেই? ফৌজদারি নেই? মহারাণীর দোহাই কি উঠে গেছে দেশ থেকে?'

'হাওলাদার সাহেবের ঘরে গেলে কত তুই সুখে থাকবি। কত ভাল খাবি, ভাল পরবি। চুড়-চিক পাবি, বিচে হার পাবি, বোরখা পরবি, মেহেদি পাতায় হাত পা রাঙাবি—'কেরামতের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

শুকনো গলায় মেহেরজান একটা ঢোক গিলল বোধ হয়। বললে, 'সোয়ামীর জীবমানে কেউ আবার নিকে করতে পারে না কি? বেঁাড়া হয়ে যায় না?'

কেরামত গঞ্জে গিয়েছিল, যদি কুলির কেরায়া পায়।

আয়নালি তার বাড়ির গায়ের পড়শী। এসে শুনল, হাওলাদার সাহেব না কি তার বাড়ি এসেছিল দুপুরবেলা। লুকিয়ে লুকিয়ে আলাপ করে গেছে মেহেরজানের সঙ্গে। পান তামাক খেতে দিয়েছে মেহেরজান। পেয়েছে আয়না কাঁকই, বেলোয়ারি চুড়ি কয় গাছা।

বুক ও পিঠের পেশীগুলো রাগে ডেলা পাকিয়ে ওঠে। তক্ষুনি ছুটে যায় কেরামত। কিছু জিগগেস করবার আগেই মেহেরজান নিজের থেকে এনে দেখায়, ভাঙা আয়না, ভাঙা চিরুনি, টুকরো টুকরো কাঁচের চুড়ি। বলে, 'পোড়ারমুখো মিনসের আস্পদ্দা দেখ। ঘরের বউকে কি না প্রলোভন দেখায়, উপহার দেয়। ও-ও এনেছে, আমিও অমনি শোধ দিয়ে দিয়েছি। শিল দিয়ে ভেঙেছি গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে।'

নিমেষে জল হয়ে যায় কেরামত। জিগগেসও করে না, কখন এ সব সে ভাঙলে সত্যি সত্যি। জানতেও চায় না, পান তামাক খেতে দেয়ার গল্পটা সত্যি কি না।

শুধু মেহেরজানকে দেখে, আরেকবার দেখে। কি সুন্দর টানা চোখ, পাখি-ওড়া ভুরু, পাখির বুলির মত কথা।

গেরস্তালিতে কত মন! কুচি-কুচি করে গরুর জাব কাটছে। গোবর লেপছে। সাঁজালি দিচ্ছে। কেরামতের জন্যে তামাক সেজে কলকেতে ফুঁ দিচ্ছে।

আয়নালি শুধু খারাপ-মন্দ খবর দেয়। বলে, 'তোর পরিবারকে দিয়ে মামলা বসাবে হাওলাদার সাহেব।'

'কিসের মামলা?'

'বিয়ে-ছাড়ানের মামলা।'

'কেন, ওজুহাতটা কি?' কেরামত ঘাড় মোটা করে দাঁড়ায়।

'সে উকিল-মোক্তারই বলতে পারে।'

কেরামত তক্ষুনি ছুটে যায় মেহেরজানের কাছে। বলে, 'তুই না কি বিয়ে-তোড়ার মামলা করবি?'

স্বচ্ছ উপেক্ষার সুরে মেহেরজান বলে, 'কোন দুঃখে?'

'বাড়ি-ঘরের নাম-নিশানা নেই, হাওলাত-বরাত করে খাই, আমার ঘরে থাকতে কি আর তোর ভাল লাগবে?'

'ক্ষুদ্দুর লোক হলে বউ রাখতে পারবে না, এমন কথা শাস্তরে লেখা নেই।'

'মুখখু-সুখখু মানুষ আমি—'

'আর আমি একটা পণ্ডিত। কেতাব-খেতাব কত আমার!'

ঠাট্টার হাওয়ায় মনের মেঘ কেটে যায় কেরামতের। ভাবে, বিয়ে তোড়বার কারণ কিছুই নেই দুনিয়ায়। মার-ধোর করেনি কোনো দিন; যেমন অবস্থা, খোরাকপোশাক চালিয়ে এসেছে প্রাণপণ। ব্যামোপীড়া নেই, মদ-ভাঙ খায়নি জীবনে। গারব বলেই যদি বিয়ে তুড়ে দেয়া যেত, তা হলে আইন হয়ে গরিবানা উঠে যেত সংসার থেকে।

বিয়ে-ছাড়ানের মকদ্দমা নয়, আয়নালি নতুন খবর জোগাড় করে আনে—একদিন মেহেরজানকে নিয়ে সটকাবে হাওলাদার সাহেব, স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা করবে। মেহেরজান আর কেরামতের স্ত্রী নয়, কেরামত তাকে তিন-তালাক বাইন দিয়েছে।

'স্বপ্নে ?' কেরামত তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

'সাক্ষী সাজাবে হাওলাদার সাহেব। মৌখিক সাক্ষী। সবাই বলবে, তারা শুনেছে স্বকর্ণে স্বামি-স্ত্রীতে খুব কসে ঝগড়া-বচসা হার পরব কেরামত রাগ করে বলে উঠল, তালাক, তালাক, তালাক—বাইন! দশ, বিশ, পঞ্চাশ জন সাক্ষী মানবে সমন করাবে।

'ইস ? আমার রেজেস্টি-করা বিয়ে। কাবিননামা আছে।' চিবুক ভারি করে বললে কেরামত।

'তোর কি বুদ্ধি! ঠাট্টা করেও যদি বউর কাছে তুই তিন বার তালাক বলিস, তোর বিয়ে অমনি ভেঙে যাবে।'

'বললে তো ? জোর করে তো কেউ আর বলাতে পারবে না আমাকে দিয়ে।' কত বড জোর, কতখানি শান্তি কেরামতের।

'বলাতে পারবে না, শোনাতে. পারবে।' কুটিল চোখে তাকায় আয়নালি: 'ফেরবি সাক্ষী তৈরি করবে। কত জোরমন্ত লোক সে। কত মুন্সি-মোল্লা, সর্দারসিপাই হাতে তার—

তবু কেরামত ভয় পায় না। সরল বিশ্বাসে হাসে। বলে, 'কেউ বিশ্বাসই করবে না। এত যাকে ভালবাসি তাকে খামোকা-খামোকা মুখের কথায় তালাক দিয়ে দেব? দিনের বেলার হাজার লোক যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে চোখ বুজে বলে যায়, অন্ধকার, তা হলেই আকাশের সুজ্জি নিবে যায় না মিয়াসাহেব।'

'তোর মুখের কথাকে এত বিশ্বাস? কিন্তু ভালবাসাটাও মুখের ভালবাসা।'

তক্ষুনি আবার কেরামত ছুটে যায় মেহেরজানের কাছে। মেহেরজান তখন হেলি-পাতা আর হোগলাপাতা মিশিয়ে চেটাই তৈরি করছে। কেরামত তার পাশে বসে হাত ধরে ফেলে কাজে বাধা দেয়। বলে, 'এ সব শুনছি কি?'

মেহেরজান চোখ গোল করে বলে, 'কি সব?'

সব কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারে না কেরামত। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে-ঠেলে ওঠে। বলে, 'তুই না কি ছেড়ে যাচ্ছিস আমাকে?'

'কেন, যোমরাজা টানছে না কি চুলে ধরে? না, তোমারই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবার মতলোব? ঘাটে-অঘাটে মনে ধরেছে বুঝি কাউকে?' হাতের উলটা পিঠ দিয়ে মেহেরজান চোখ মোছে।

কেরামত চিৎ হয়ে শোয়। অন্তত এখন শুয়েছে, ঘুমিয়ে আছে।

বাঁ-হাতের চেটোটা উপরমুখো। আঙুলগুলো ফাঁকফাঁক, বুড়ো আঙুলের মাথাটা স্পষ্ট।

ভুষো তৈরি করেছে মেহেরজান। তারি খানিকটা আঙুলে করে কেরামতের সেই বুড়ো আঙুলের মাথায় সে মেখে দিল আলগোছে, যেন বা কত আদর করে।

এমন বেঘোরে ঘুমোয় কেরামত, বাড়িতে ডাকাত পড়লেও বোধ হয় ভাঙবে না। এক ঝাঁক মাছি যে মুখের উপর উড়ে-উড়ে বসছে, তাতে তার বিরক্তি নেই এতটুকু।

দলিল নিয়ে ঢুকলো আয়নালি। জায়গায়-জায়গায় টিপ নিলে, আঙুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। কেরামতের বাঁ হাতের কালি-মাখানো বুড়ো আঙুলের টিপ।

আয়নালি রেজেস্টি-আফিসের মোক্তারের মুহুরি। সে জানে কটা টিপ লাগে। কোথায় কোথায় লাগে।

দরজার বাইরে হাওলাদার সাহেব দাড়িতে হাত বুলান আর মুচকি মুচকি হাসেন।

টিপটাপ নেওয়া হয়ে গেলে মেহেরজান বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে। এক হাতে দলিল, আরেক হাতে মেহেরজানের হাত ধরে দুপুরের রোদে মাঠ পেরিয়ে চললেন হাওলাদার সাহেব।

গায়ে ঠেলা দিয়ে কেউ জাগায়নি আজ। কেরামতের যখন ঘুম ভাঙল, বেলা তখন একেবারে গড়িয়ে গেছে। চোখ কচলে চেয়ে দেখল, বাড়ি-ঘর কেমন এলোমেলো, ফাঁকা-ফাঁকা।

আনাচ-কানাচ খোঁজাখুঁজি করে এল, কোথাও নেই মেহেরজান।

'আমি তখন গাঙে গরু নাওয়াচ্ছিলাম', বললে জোনাবালি, 'দেখলাম এক ছাতার নিচে যাচ্ছেন হাওলাদার সাহেব আর তোর মেহেরজান।'

'আমি আসছি তখন পোলের উপর দিয়ে,' বললে হাসমত, 'দেখি হাওলাদার সাহেবের সঙ্গে তোর পরিবার। বললাম 'এ কি, কেরামতের পরিবার আপনার সঙ্গে যে? চলেছে কোথায়?' হাওলাদার সাহেব চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ও-সব চর্চায় তোর দরকার কি?'

হন্যে হয়ে উঠল কেরামত। এ-গাঁ থেকে ও-গাঁ, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি সরিয়ে রাখছে মেহেরজানকে। পাত্তা-নিশানা খুঁজে পাচ্ছে না। থানায় গিয়ে শেষে সে এত্তেলা দিলে। মোক্তার লাগিয়ে বার করালে তদন্তের পরোয়ানা।

হাওলাদার সাহেব দলিল বের করে দেখালেন। তালাকনামা। স্ট্যাম্প-কাগজে লেখা, শিল-মোহর করা। রেজেস্টারি হাকিমের সই এই লাল কালিতে। আর এই কেরামতের টিপ। হলফান বলুক দেখি ও, এ টিপ ওর নয়! টিপ-পরখের সাক্ষী আসুক কলকাতা থেকে, যত টাকা লাগে আমানত করবে সে চালান দিয়ে। আর, নিশিন্দি করেছে ওর বাড়ির গাঁয়ের মানুষ, আয়নালি, রেজেস্ট্রি-আফিসের দলিল-লেখক।

এতটুকু জালসাজি নেই কোথাও। আর, এই দেখুন না, কি লেখা আছে দলিলে : "এতদর্থে সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্বক সরল মনে সুস্থ শরীরে স্থির বুদ্ধিতে স্বাধীন সম্মতিতে অন্যের বিনানুরোধে অত্র তালাকনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম।"

কেরামত মানুষ না পশু, গাছ না পাথর, কিছুই বুঝে উঠতে পারলনা নিজেকে। শুধু বললে একবার বেবভুলের মত: 'একটিবার মেহেরজানের সঙ্গে চোখোচোখি দেখা করিয়ে দিতে পারেন?'

কি সর্বনাশ! হাওলাদার সাহেবের সঙ্গে তার নিকে হয়েছে। মসজিদে যে ইমামতি করে সেই কাজীসাহেব তার বিয়ে পড়িয়েছে। এই দেখুন কাবিননামা। হাওলাদারের বিবি। এখন সে পর্দার হেপাজতে, ঘেরাটোপের মধ্যে। মিঞাদের বাড়ির বউ এখন সে, বাইরের লোকের সামনে বের হয় এমন হাদিস নেই।

এত জালজোচ্চুরিতেও কিছু এসে যেত না কেরামতের, যদি নিরালায় মেহেরজানের সঙ্গে তার একটু দেখা হত। যদি আরেকবার তাকাতে পারত তার চোখের দিকে।

কিন্তু আর এল না মেহেরজান। সমস্ত প্রবঞ্চনার চেয়ে এই নিষ্ঠুরতা তার অসহ্য।

মোক্তারবাবু অনেক নিষেধ করলেন, তবু কেরামত ফৌজদারি করলে। আসামী খালাস পেয়ে গেল, তবু কেরামত ক্ষান্ত হয়না।

যা অসত্য ও অধর্ম তা স্থায়ী হতে পারে না, এই তখনো তার অন্তরের বিশ্বাস। সে দেওয়ানি করলে। বউ-দখলের মোকদ্দমা। সে-মোকদ্দমায়ও তার হার হল। টিপ-পরীক্ষক সাক্ষী দিলে তালাকনামা খাঁটি দলিল।

আগে খোরাকের ধান বেচেছিল কেরামত, আস্তে আস্তে গরু, শেষে জমিটুকুও বেচে দিল। সব গেল উকিল-মোক্তারের পকেটে। আইনের রগুমে।

আদালতের বাইরে এসে দাঁড়াল কেরামত সদর রাস্তার উপর।

মোক্তারবাবু বললেন, 'লেখাপড়া শেখ, বুঝলি লেখাপড়া শেখ। লেখাপড়া না শিখলে সব যাবে, জমিজিরাত গেছে, জরু গেছে, সমস্ত দেশ যাবে রসাতলে।'

জমিজিরাত গেছে। জরু গেছে। কিন্তু চার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে কেরামত ভাবল, দেশটা কি জিনিস।



হাওয়াতে কাপড় শুকোতে দিয়েছে তসলিমা। শুকোতে দিয়েছে দড়ির উপরে নয়, পাশাপাশি দুটো গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে। দড়ি র্যন্ত একটা জোটানো যায় না আজকাল।

নদীর পারে হিজল গাছ গুঁড়িটা জলের মধ্যে ডোবানো। বর্ষায় জল বেড়েছে এ সময় তা ছাড়া এখন জোয়ার। পুবে হাওয়া দিয়েছে। ডালের সঙ্গে আঁচলের দ্বিতীয় প্রান্তটা বেঁধে ভিজা গায়ে জলের মধ্যে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল তসলিমা।

নদীর পারটা এখন নিরিবিলি। নৌকাও অনেক কম। বেলা হেলে গিয়েছে। শাড়িটা আধছেঁড়া। ঐ একখানা শাড়িই তসলিমার। টেনেবুনে টায়টোয় চলে কোনো রকমে।

চান অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। এখন জলে গা ডুবিয়ে আছে শাড়িটা শুকোতে দেবার জন্যে। রোদ তত নেই। হাওয়াতেই শুকিয়ে যাবে দেখতে-দেখতে।

কি-রকম অদ্ভুত লাগে এমনি গা ডুবিয়ে বসে থাকায়। সরম

লাগে না বটে, কিন্তু কেমন নিশ্চিন্তও মনে হয় না। জলকেই একেক সময় নির্লজ্জ মনে হয়।

দূর দিয়ে-দিয়ে একেকটা নৌকো যায়। মাঝি-মাল্লার কথা আসে কানে ভেসে। অমনি মাথা ডুবিয়ে তলিয়ে যায় তসলিমা।

কে জানে কার নৌকো . মহাজনের হতে পারে, সোয়ারীর হতে পারে। হতে পারে বা ডাকাতের দলের। কয়েক মাইল উজিয়ে গেলেই ডাকাতদের ইলাকা। সময়ে-অসময়ে গির্দের বাইরে ওরা ঘোরাঘুরি করে। খবর থাকলে নিয়ে যায় সর্দারের কাছে।

দুটো জিনিসের উপর ওদের দৃষ্টি। এক সোনারুপো, টাকা-পয়সা ; দুই মেয়েলোক। আগেরটা আসল, পরেরটা ফাউ। পারে শাড়ি শুকোচ্ছে আর জলের উপরে ভাসছে তার খোঁপা, বুঝতে পেলে ডাকাতের দল এখুনি এসে ছোঁ মারবে। ফাউ যদি এমন অসহায় ভাবে ভেসে বেড়ায় তবে আসলে তাদের দরকার নেই।

তসলিমার ঘরের পুরুষের নাম পবন গাজী। চুরি করে তিন মাস জেল খেটে বেরিয়েছে। যে অবস্থা, বলে-বলে তসলিমাই তাকে চুরি করতে পাঠিয়েছে। কিন্তু সামান্য সিঁদ কাটবার পর্যন্ত মুরোদ নেই পবনের। বন্ধ ঘরের বাইরে বারান্দায় একখানা কাপড় টাঙানো ছিল, ছিল ঘটি আর বালতি, তাই ধরে সে টান মারল। হায়, তা নিয়েও সে সটকাতে পারল না ; পড়ল পা হড়কে, হুমড়ি খেয়ে।

জেল থেকে বেরিয়ে সে দিব্যি করেছে আর কোনো দিন চুরি করবে না। সৎপথে থেকে চাষবাস করবে। তাই শহরে গেছে সে বীজ ধানের জন্যে লোন আনতে। বলেছে, খোদার মার খাই অনেক ভালো, মানুষের মার খেতে পারব না।

চোর সত্যি ভালো লাগে না তসলিমার। তারা বড় দুর্বল, নিরীহ। রঙচঙ নেই, রপট-দাপট নেই। তার চেয়ে ডাকাত অনেক ভালো। মুখোস আছে, মশাল আছে, হাতিয়ার আছে। অনেকে দল বেধে থাকে বলে ভয়-ডর কম। ধরা পড়ে না বললেই হয়। পুলিশ পর্যন্ত হাত-ধরা। হাকিম-মোক্তাররা পর্যন্ত সমঝে চলে। অনেক মানী ব্যবসা।

জেল থেকে বেরিয়ে এলে পর পবনকে বলেছিল তসলিমা: 'ডাকাতের দলে গিয়ে চাকরি নাও। এমনি করে চলবে না আর। সবাই ভাসব তবে।'

'ভাসান-ডুবান খোদার হাতে। আমাকে পাপের পথের কথা আর বলিসনে, লক্ষ্মী। আমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখব।'

তসলিমা কোনোই ভরসা পায় না। ক' দিন পরে তাকে হয়তো রাতের অন্ধকারে চান করতে আসতে হবে।

কি ভাবতে ভাবতে জলে বুজকুড়ি কাটছিল তসলিমা। হঠাৎ চেয়ে দেখল হাওয়ায় তার শাড়িটা উড়ে চলেছে। উড়ে চলেছে তার মাথার উপর দিয়ে। লাফিয়ে দু' হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল তসলিমা, পারল না। নৌকো নেই, পাল উড়ে চলেছে।

তক্ষুনি-তক্ষুনি জলের মধ্যে নেমে পড়তে হবে বলে গিঁট ছটো ভাল করে দেয়া হয়নি নিশ্চয়। কিন্তু এখন উপায় কি? ছেঁড়া ধুকড়ি হলেও একটা কিছু অন্তত চাই তো কোমরে জড়াবার। নইলে পারে সে ওঠে কি করে? উঠেই বা যায় কোথায়? দিনের আলোর মুখ দেখে কোন সাহসে?

এমন সর্বস্বান্ত বলে আর কখনো অনুভব করেনি নিজেকে। হাওয়া চুরি করতে এসে ঠকে গেছে অনেকবার, কিন্তু আজ একেবারে ডাকাতি করে নিয়ে গেল।

না, ছেড়ে দেয়া হবেনা ডাকাতকে। তসলিমা তার পিছু নেবে। ডাকাতের উপরে ডাকাতি। উচ্ছৃঙ্খলকে বশ করবে তার এই নতুন উচ্ছৃঙ্খলতায়।

শাড়িটা উড়ে পড়েছে জলের উপর। যদিও মাঝ-গাঙে। সাঁতার জানে তসলিমা। ডুব-সাঁতার। মাছের মত জল কেটে ঠিক চলে যাবে গা ডুবিয়ে। ধরবে শাড়িটা, হাওয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। সে এখন সমান দুর্দাম।

তসলিমা সাঁতার দিল।

সাপ্লাই-ঘরের বড়বাবু বাড়ি চলেছেন। সাথী পেয়েছেন খাসমহলের তশিলদার। ছ'জনেরই চারদেঁড়ে পানসি। সঙ্গে

বহুৎ মালামাল। নৌকোর উপর-নিচ, গলুই-মাঁলকোঠা, সব একেবারে ঠাসা।

মাইনে কম পেলেও দু'জনেরই মোটা আয়। দু'জনেরই উমি লোক নিয়ে কারবার। একজনের রেশন-কার্ড আর সাপ্লায়ের শ্লিপ নিয়ে কারসাজি, আরেক জনের দলিলা আর চেকমুড়ি নিয়ে। দু'জনেরই বিস্তর অবস্থা।

দু'জনেরই দূরের রাস্তা। রাত পড়ে নদীতে। তাই কেউই পরিবার নিয়ে থাকেন না। সঙ্গে নৌকোতে তাই কোনো মেয়েছেলে নেই। শুধু বড়বাবুর দুটি ছেলে চর অঞ্চলে বাপের কর্মস্থানে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করতে এসেছিল, এখন ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। তশিলদার রঘুনাথবাবুর সঙ্গে একটা চাকর।

নৌকো দুটো পাশাপাশি চলেছে। জোয়ারের সঙ্গে গা মিশিয়ে। নদী এখন গোপালের মত ঠাণ্ডা। আকাশের মেঘের চেহারায় ঝড়ের ইসারা নেই।

সন্ধে নাগাদ ফুলঝুরি বন্দর পাওয়া গেল।

'কে যায়?' ঘাটে বাঁধা নৌকোর ভিতর থেকে কে জিগগেস করলে।

'সরকারি।'

ফ্ল্যাগ টাঙানো নেই কেন?'

'আরে, নায়েব মশাই নাকি?' গলা ঠাহর করে মুখ বাড়িয়ে সাপ্লাইবাবু সহর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

'আরে, আপনি? সঙ্গে রঘুবাবুও আছেন? ব্যস, কুছ পরোয়া নেই।'

নায়েবমশাইও বাড়ি চলেছেন নৌকো করে। কোনটা ফস করে ডাকাতের নৌকো হয়ে যায় তাই প্রত্যেকটা নৌকোই একটু প্রথমে চাপাচুপি দিয়ে থাকে। বড় একটা ধার ঘেঁসে না। বৈঠার মুঠি আলগা করে না একটুও।

নায়েবমশাই সঙ্গীর জন্যে বসে ছিলেন ঘাপটি মেরে। এবার তিনিও খুলে দিলেন নৌকো। সঙ্গে তাঁর জমা-সেরেস্তার মুহুরি।

'হাতিয়ার আছে কিছু সঙ্গে?' জিগগেস করলেন বড়বাবুকে।

'একটা শুধু ছাতা। আপনার?'

'এই খেলো হুঁকোটা। আপনার কিন্তু একটা বন্দুক করা উচিত ছিল, রঘুবাবু।'

রঘুবাবু তাঁর নৌকো থেকে বলে উঠলেন: 'পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ি। একবার চেষ্টা করেছিলুম লাইসেন নিতে। উঃ, কি গরমাই! চোরের ধন শেষকালে বাটপাড়ে খেয়ে যাক আর কি। হেভের-শাবলে দরকার নেই বাবা, যি-রাখালের খোদাই রাখাল।'

তিন-তিনটে নৌকো। মাঝিমাল্লা অনেকগুলি। তা ছাড়া সবাই পুরুষ। তেমন ভয় করবার আছে কি?

আশে-পাশে ছড়ানো-ছিটানো জেলে নৌকো। মাছের অপেক্ষায় বসে আছে জাল পেতে।

সাঁ করে একটা ছিপ নৌকো তীরের মত বেরিয়ে গেল। রঙচঙে ঘাগরা ও ফোলানো-ফাঁপানো একটা খোঁপা দেখা গেল।

'ঐ কে যায়? মেয়েমানুষের মত মনে হয় না?' জিগগেস করলেন নায়েব মশাই।

'মগনী আর মগ।'

'ওদের ধরেনা ডাকাত?

'সঙ্গে ছেনা আছে মগনীর। সটান বসিয়ে দেবে ঘাড়ের উপর।'

'আর মগ?'

'সে আফিঙে বুঁদ হয়ে বসে গোল পাতার বিড়ি টানবে।'

হঠাৎ দূরে কতগুলি ফোঁটা-ফোঁটা আলো দেখা গেল। যেন জলের দর্পণে একখানা শহর জ্বলছে।

এক ঝাঁক বেদের নৌকো। গায়ে-গায়ে লাগিয়ে রান্নাবাড়া খাওয়া-দাওয়া করছে হয়তো।

বিশখালীর মুখে পড়তেই চারিদিক কেমন হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে এল। আসলে শব্দ আছে অনেক, কিন্তু কেরোসিনের আলো নেই এক বিন্দু। মানুষের হাতের তৈরি কোথাও একটুও পরিচয়চিহ্ন নেই বল্লেই যেন এত বেশি শব্দশূন্য মনে হয়।

মাঝিরা বললে: আরেক জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ছ'ঘণ্টা। এই তকে খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া যাক।

ঘুমে একেবারে সব মজে যায় না যেন। অন্তত মাঝিরা যেন হুঁসিয়ার থাকে। শোনা গেছে ঘুমন্ত নৌকার কাছি কেটে দিয়ে গেছে ডাকাতে। স্রোতের টানে ঠিক চলে গিয়েছে তাদের কোটের মধ্যে।

রাত প্রায় তিনটে, নৌকোগুলি ফের খুলে দিল। জোয়ারের জোর জেগেছে নদীতে। সবাই ঘুমুবেনা-ঘুমুবেনা করেও ঘুমিয়ে পড়েছে। মরা-মরা জ্যোৎস্না উঠেছে শেষ রাতের।

একখানা ডিঙি নৌকো পূব পাশ কেটে চলেছে উত্তর দিকে। যেতে যেতে জিগগেস করছে হাঁক দিয়ে: 'আরে পানসি, যাও কই?'

মাঝি বললে, 'বটতলি।'

'গ্যাছেলে কই?'

'লাটগাছি।'

'ক্যান?'

'হদায় আনতে।'

'কি হদায়?'

'দাফনের কাপড়।'

ভিতর থেকে বড়বাবু গর্জে উঠলেন: 'যার মনে যে যায়, অত গায়ে পড়ে আলাপ করবার দরকার কি?'

মাঝিরা হেসে উঠল: 'সব ভুল ঠিকানা দিয়া দিছি। মোরা অমন বোকা-বলদ না। হুঁসবোধ আছে মোগো।'

'যখনই কেউ জিগগেস করবে কার নৌকো, বলবি মোক্তারের নৌকো, রামহরি মোক্তারের।' নায়েব মশাই বললেন তাঁর নৌকো থেকে : 'ওরা পুলিশকেও তত মানে না যত মোক্তারকে মানে। জামিন দাঁড়াতে মোক্তার, খালাস করতে মোক্তার।'

'জে বাবু।' মাঝিরা সায় দিল।

আর কতদূর এগিয়ে আসতেই দু'দিক থেকে দু'খানা নৌকো বড়বাবু আর নায়েবমশাইর চলতি নৌকো দুখানা ঘিরে ধরল। বিপদ বুঝে মাঝি-দাঁড়িরা হাল বৈঠা দিলে ছেড়ে, আর নৌকোর ভিতরের জিনিসগুলি একটার গায়ে একটা লেগে এদিক-ওদিক উলটে পালটে পড়ল। মাথার উপর ঝুলছিল লণ্ঠন, এ পাশে ও পাশে দুলে বাড়ি খেতে লাগল ছইয়ের সঙ্গে।

'এ সব কি ?' মূঢ়ের মত জিগগেস করলেন বড়বাবু।

'এ পথে যা অয়।'

বলতে বলতে বার চৌদ্দ জন লোক একযোগে লাফিয়ে উঠল দুই নৌকোর উপর। পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট, গায়ে খাকি হাফ সার্ট, মুখে সাদা রং মাখা, গলা থেকে মাথা পর্যন্ত খাকির গলাবঁদ জড়ানো। কারু হাতে এক বাঁও লম্বা ল্যাজা, কারু হাতে বা চোখ আঁকা রাম দা। কারু হাতে ঠ্যাঙা।

ডাকাতদের নৌকোর ভিতর থেকে বুড়ো সর্দার দর্জন আলি বলে উঠল : 'যা হালারা মিডা কথায় কাম হয়না, হাইন্দা যাইয়া ত্থাক, গয়না গাড়ি কি আছে।'

উত্তর এল ডাকাতদের : 'মাইয়ালোক নাই একডাও।'

'নাই ?' হতাশটা প্রায় সকলের গলায় ফুটে উঠল হাহাকারের মত।

রঘুবাবুর নৌকো পিছনে পড়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার রাস্তা নেই।

জিগগেস করলেন মাঝিকে : 'তিন নৌকোয় এত লোক, কিছুই কি করবার জো নেই ?'

'না বাবু। অরা অনেক মানু, হুদাহুদি পরাণ খুয়ামু।'

'মাঝি, যা চায় তাই দেব, প্রাণে যেন মারেনা।'

'কেমনে কমু বাবু। তয় বাদা দেলে কি অয় আল্লা জানে।'

পূব দিক থেকে একখানা ছিপ এসে রঘুবাবুর নৌকোর পশ্চিম ধার ঘিরে ভেড়াল হঠাৎ। লোক উঠলনা কেউ। রঘুবাবু মনে করলেন, বেঁচে গেলেন বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন তাঁর নৌকোতে বঁড়শি গেঁথেছে। মোটা দড়িতে বঁড়শি বাঁধা, দড়িটা ডাকাতের হাতে। গেঁথেছে ছইয়ের বাঁখারির সঙ্গে। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে আগের নৌকো দুটোর পাশে। মিলিয়ে দিচ্ছে গায়ে গায়ে

'এইডার মদ্দেও মাইয়ালোক নাই।'

কিন্তু যে আছে তার ভয় মেয়েছেলের চেয়েও বেশি। যদি চিনতে পারে তাকে, প্রমাণ গুম করবার জন্তে কচমচ করে কচুকাটা করে ফেলবে।

'এই হালা মাঝিরা, তামাক খাওয়া দেহি।' একটা মাল্লার মাথায় লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিল সর্দার : 'হালারা বইয়া বইয়া তামাসা ছাহে, এ পোথে যাও, তোগো বাবাগো চেনো না ?'

'দেই বাবারা, এ্যাহোনই তামাক দেই, মাইরো না বাবাঁরা।'

'আবার কতা কয়! আগে দিয়া ল।' আবার অরেক ঘা।

বড়বাবুকে পাকড়াল কয়েকজন। ল্যাজার গোড়া দিয়ে তার বুকে এক খোঁচা মেরে বললে, 'এই হালা, চাবি দিয়া খোলবার টোলবার মোগো সময় নাই। তোগো কাপড়-চোপড় থাল-গড়ি তোরাই রাখ, টাহা-পয়সা সোনা-রুপা গয়না-গাড়ি আস্তে আস্তে থুইলা দে। তো জীবনে মারমু না, হ্যা না অইলে—বোজজো ?' মাথার উপরে দা ধরল উঁচিয়ে।

'আরে এই তো পাইচি। হা আল্লা, এই ছুইডাও পোলা, এউগাও মাইয়া না।'

বড়বাবুর ছুই ছেলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল জড়সড় হয়ে। উঠে বসে কাঁদতে সুরু করল।

মনের মত বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। তিন নৌকোতেই শুধু কাপড়ের পুঁটলি। বড়বাবু সরিয়েছেন সাপ্লাই ঘর থেকে, নায়েবমশাই হাটের তোলা থেকে, আর রঘুবাবু কালোবাজার ঘুরে। গ্রামাঞ্চলেই আজকাল কালোবাজার। গাঁ যত অজ, বাজারও তত তেজী।

নগদ মোটে তিন শো বাইশ টাকা পাওয়া গেল। গয়না-

গাঁটি নেই, সোনারুপা নেই। এমন সৃষ্টিছাড়া, সংসারী মানুষ সবাই, সঙ্গে কারুর জরু-বেটি নেই। একটা দাসী-বাঁদিও নেই খেদমত খাটবার।

এই বলে দমাদম মার সবাইকে। লুণ্ঠনের উত্তেজনার পরে বিশ্রামের উদ্দীপনা নেই।

'এই তুইভারে কাডলেই আরো পাওন যাইবে। দেহি রে রামদাওহান।' দর্জন গর্জন করে উঠল।

বেরুল হাতের আংটি, সোনার বোতাম, আরো সাতচল্লিশটা টাকা। কিন্তু হায়, চুড়ি-বালা নেই, হার-চিক নেই, বাজু-বিচে নেই। রুপোর কিছু গেঁয়ো জেওর হলেও মন্দ হত না। খাড়ু বা তোড়া, বেঁকি বা বটফুল। মারল আরো কতগুলি লাঠির বাড়ি।

বুনো, বর্বর। দয়া-ময়া নেই, বোধ-বুদ্ধি নেই। হামি হয় না কেউ, বাধা দেয়না কেউ, তবু মার খায়। কেন সব ঠিকঠাক মনের মত হয়নি তাই মার। বাধা দিলে ল্যাজার ল্যাজ নয়, মুখ উঠত মৃত্যুমুখ হয়ে।

'কাটকি দ্যাও না কি দ্যাও দেইক্যা লই—' সব অলছতলছ করতে লাগল। অনেক কষ্টে বেরুলো কটা তামার পয়সা। বহুদিনের বিস্মরণের মুখ।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মার-খাওয়া নৌকো তিনটে চলল উত্তরে।

নায়েবমশাই বললেন, 'আর যা নিয়েছে নিক বাবা, কাপড়ের গাঁটরিটা যে নেয়নি।'

সকলেই তাই একমত। টাকা-পয়সা একবার গেলে আরেকবার হবে। কিন্তু কাপড় পাবে কোথায়? বেটারা অজবুক আহাম্মক।

সত্যি যে আহাম্মক, তাতে সন্দেহ কি। এতক্ষণে মনে হল দর্জন আলির। ভোরের আবছায়ায়। দেখলে তার বাড়ির ঘাটের মুখে খালের মুখটা যেখানে সরু হয়ে এসেছে সেইখানে কচুরিপানার মধ্যে একটা কচি মেয়েমানুষ। মরে আছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে মরে আছে। সারা গায়ে লজ্জার এতটুকু একটা আঁশ নেই।

হয়তো ব্যামো-পীড়া হয়েছিল কিছু, ভাসিয়ে দিয়েছে। কিংবা খুন-খারাপি করেছে কেউ। কিংবা মরেছে জলে ডুবে।

মরে যখন আছে, আর তার বাড়ির ঘাটের-কিনারে, গোর দিতে হয় নিশ্চয়। অধর্ম করতে পারে না দর্জন আলি।

কিন্তু দাফনের কাপড় কই?

কাপড়ের বাণ্ডিল ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত গোখুরি করেছে। ছোকরারা বেরুল আবার নৌকো নিয়ে। এবার আর সোনা-রুপো নয়, টাকা-পয়সা নয়, শুধু একখানা নতুন কাপড়।

দিনের দিকে শিকার মিলবে কোথায়? ও তিন নৌকো কখন চলে গিয়েছে সরহদ্দের বাইরে।

ফিরে এল ছোকরারা। বলাবলি করতে লাগল, 'আগে জোড়লেই তো বালা আছেলে।'

· সে কি কাপড় না ঐ দেহ—কে বলবে।

অনেক লাশ মাটির তলায় পুঁতে রেখেছে দর্জন আলি। কিন্তু এমন নিঃসহায় অবস্থার লাশ সে দেখেনি আগে। বাতবন্যা হোক, আত্মহত্যা হোক, খুন খারাপি হোক, এরকম নিস্তব্ধ হয়ে কেউ জলে ভাসে না।

দর্জন আলির 'সাজিয়া' বিবির ঘরে নতুন কাপড় আছে। তাই সে বার করে দিতে বললে একখানা।

কচুরিপানার জঙ্গল থেকে লাশ টেনে তোলা হল ডাঙার উপরে। গরম জলে গোসলের দরকার নেই, কারীও মিলবে না হাতের কাছে। শুধু কাপড়টা বিছিয়ে দেয়া হল গায়ের উপর।

অমনি সরমের পুঁটলি হয়ে উঠে বসল তসলিমা। তাড়াতাড়ি কোমরের নিচে ঘের দিলে, বুকের উপরটা একটু গোছালো করে নিয়েই টেনে দিলে ঘোমটা।

সবাই উল্লাস করে উঠল। মরা দেহটা বেঁচে উঠেছে বলে নয়, আসলের পর ফাউ জুটেছে বলে।

তসলিমা বুঝতে পেরেছে সে সটান একেবারে ডাকাতের বাড়ি চলে এসেছে। ঐ তার টিনের ঘর, এই কোলা, নদীর ঘাট। এখুনি তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবে পাথালিকোলা

করে। বরু বিবি আছে, মাজু বিবি আছে, সাজু বিবি আছে, সে হবে ছুটু বিবি। আল্লা আজ তাকে একেবারে সৌভাগ্যের ঘাটে এনে পৌঁছে দিয়েছেন।

দর্জন আলি খানিকক্ষণ থ হয়ে রইল। ভাবলে, মনে একটা সদিচ্ছা হয়েছিল বিনাবস্ত্রে তাকে গোর দেবে না, সেই সদিচ্ছার জোরেই মেয়েটা বেঁচে উঠেছে।

সবাইর উৎসাহের আগুনে জল ছিটিয়ে দিল দর্জন আলি। বললে, 'অরে অর বাড়তে দিয়া আয় জলদি। কোন হানে বাড়ি জিগাইয়া ল। আর হোন—'

দর্জন আলি চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। বললে, 'মোগো নাওয়ে যাবি না, একডা চলতি নৌকা কেরাইয়া করিয়া ল। মোগো নাওয়ে গেলেই হগলড়ি বাববে বেডির হুরমত গ্যাচে। আর হোন—'

দর্জর আলি আবার ফিরে এল। এবার গলা রুক্ষ, শাসনের তেজ দুই চোখে। বললে, 'আর, খবরদার, বেডির গায়ে হাত ছোয়াইতে পারবি না। যে কাপড় দিছি ওর গায়ে হ্যা যেন নিটুট থাহে।'

ম্লানমুখে বাড়ি ফিরে এল তসলিমা।

লোনের তদবির সেরে তখনো ফিরে আসে নি পবন গাজি। ফিরল পরদিন সন্ধ্যায়। লোন পায়নি সে কাণাকড়িও, বড় মিয়াকে ঘুস দিতে পারেনি বলে। না দিক, ভিড়ের মধ্যে থেকে

একজনের পাওনা-লোনের আঠারো টাকা সে বেমালুম পকেট মেরে নিয়ে এসেছে।

পবন গাজি ফুর্তিতে হাসতে লাগল। বললে, 'তুই কাপড় পেলি কোথায়?'

'ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ঘাট থেকে। সমস্ত রাত রেখে দিয়েছিল ওদের বাড়ির মধ্যে। সকালবেলা নতুন কাপড় পরিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল।' তসলিমা বললে প্রায় স্বপ্নের মধ্যে থেকে।

'তবু যাক পেয়েছিস তো নতুন কাপড়।' পবন গাজি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।